ওঁ

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও অবতারবাদ।

শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক প্রণীত।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।
৬০, ভবানীচরণ দত্তের লেন, কলিকাতা।

"কাস্তিক প্রেস,
২০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত।
বিনা মূল্যে বিতরণীয়।
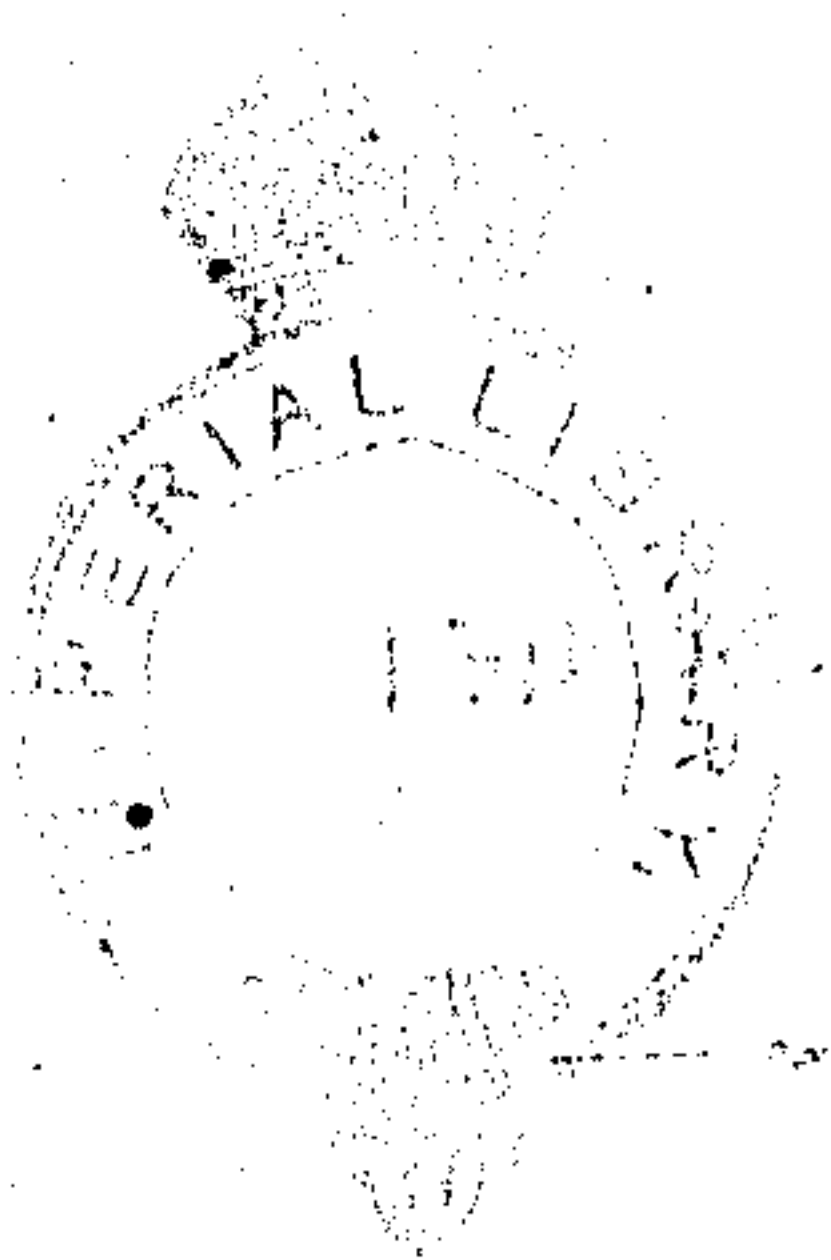
উৎসর্গ পত্র।

(শ্রীস্বামীপাদ দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া)

পরম-ভাগবত, মহানুভাব,

কাসিমবাজারাধিপতি

শ্রীল শ্রীমন্মহারাজ মুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের

শ্রীকরে এই গ্রন্থ পরম প্রীতি সহকারে

অর্পণ করিলাম।

ভূমিকা।

১। চন্দ্রহাটী গ্রামে শ্রীস্বামীপাদ অবণোর সুশীতল ছায়ায় বসিয়া শ্রান্তি দূর করিতে করিতে যে একটি বীজ পাইয়াছিলাম, সেই ক্ষুদ্র বীজটি ("সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও অবতারবাদ") এই উর্ব্বর-ভারত-ক্ষেত্রে রোপন করিলাম, এক্ষণে সহৃদয় জ্ঞানবান পাঠক সহানুভূতি-বারি দান করিলেই ইহার অঙ্কুরোদ্গম হইয়া সজীব থাকিবে।

২। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজি শিক্ষিত পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই আগমে (শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা প্রমাণ্য বিষয়ে) বীতশ্রদ্ধ, এই হেতু এই গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয় সকল কেবল মাত্র ন্যায় সঙ্গত যুক্তি, দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ (বাহ্য ও মানস), অনুমান প্রমাণ, আর্য দর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত হইল।

৩। আশা করি ইহা পাঠে অনেক-সন্দিগ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির সংশয় নিরাকৃত হইবে ইতি।

৬০ ভবানীচরণ দত্তের লেন,
কলিকাতা।

ভক্ত দাসানুদাস
শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক।

ওঁ

বিজ্ঞাপন।

১। এই গ্রন্থের নাম সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম * * , এই সার্ব্বভৌমিক-ধর্ম্মের অর্থই সকল ভূমিতে ও সকল জীবের প্রতি যে ধর্ম্ম সমভাবে সদা বর্ত্তমান আছে; অর্থাৎ এই শরীরাভিমানী দেবতা (অহং=আত্মা) হইতে যে ধর্ম্মের বিকাশ হয়।

২। আমাদের এই স্থূল শরীর, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চপ্রাণ আশ্রয় করিয়াই ঐ অহং= আত্মার ধর্ম্ম অস্মীতার অর্থাৎ আমি ও আমার ভাবের (অভিমানের) বিকাশ হয়; এই আমি ও আমার ভাব হইতেই আমাদের (সকল জীবের) মোহ, দুঃখ, সুখ প্রভৃতি অনুভব হয়।

৩। প্রতি জীবের এই দুঃখ ত্রিবিধ, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক। যোগ-দর্শনে ইহা দ্রষ্টব্য।

৪। ঐ ত্রিবিধ দুঃখ লৌকিক উপায়ে সামান্যভাবে নিবারণ হয়, আর পারমার্থিক উপায়ে অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়।

৫। গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া শীতবাতাদি হইতে শরীর রক্ষা করা লৌকিক উপায়; এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে যে মোক্ষ সাধন উপায় উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার সাধনই পারমার্থিক উপায়।

৬। ঐ পারমার্থিক উপায় অবলম্বন করিয়া (মোক্ষ ধর্ম্ম সাধনে) ভারতবাসী একান্ত তৎপর, এবং ভারতভূমিই তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত ভূমি, "সার্ব্বজনীন-উপাসনা ও সাম্যবাদ" গ্রন্থে তাহা উক্ত হইয়াছে; এবং এই গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, মূল মোক্ষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে "নিজের সহিত সকল প্রাণীর সমান উপমা ধারণ করিবে, সকল প্রাণীকে নিজের আত্মার ন্যায় ভালবাসিবে, কাহারও স্থূল শরীরে ও মনে ক্লেশ দিবে না;" ইহাই "সার্ব্বভৌমিক-ধর্ম্ম"।

হায়! আজ এই ভারতবর্ষে সেই ভারতবাসীর (বিশেষতঃ সহৃদয় কোমল মতি বঙ্গবাসীর) মধ্যে কেহ কেহ সেই "সার্ব্বভৌমিক-ধর্ম্ম-পাদপের সুশীতল ছায়ায় বাস করিয়া হৃদয় শূন্য পাষাণের ন্যায় anarchist সাজিয়া গুপ্ত-নর-হত্যা করিতেছে!! ছি! ছি!!! তোমাদের শত ধিক!!!

৭। ঐ যে গুপ্ত নরহত্যাদি করিতেছে ইহার পরিণাম ফল কি হইবে স্থির করিয়াছ?— মনে করিয়াছ কি, ইহাতে ভারত স্বাধীন হইবে? তাহা মনে স্বপ্নেও স্থান দিও না, এই অধর্ম্মের পরিণাম ইহলোকে পতনের চরমাবস্থা এবং পরলোকে নিরয় শরীর ধারণ। ৯

৮। হে বঙ্গীয় উৎশৃঙ্খল যুবক, তোমাকে আমি বিনীতভাবে জানাইতেছি, একবার "সার্ব্বজনীন-উপাসনা ও সাম্যবাদ" পাঠ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় করিও। ঐ গ্রন্থে তোমার উন্নতি ও অবনতির পথ সম্মুখে দেখিতে পাইবে। একটু ধীরভাবে পাঠ করিলেই প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি হইবে। ইতি।

বিনীত
প্রকাশক।

ওঁ

সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও অবতারবাদ।

"মূর্ত্তি উপাসনা এবং জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের সমন্বয়", "সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ" গ্রন্থদ্বয়ে আর্ষোপদিষ্ট মূর্ত্তি উপাসনা (নাম, রূপ ও গুণ) কি, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, উপাসনা কি, অবতার কি, সাম্যনীতি কি, ইত্যাদি বিষয় মীমাংসা করা হইয়াছে ; এক্ষণে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও অবতার কি, তাহা বিশদভাবে প্রমাণ করা যাইতেছে।

২। কোন বিষয় প্রমাণ করিতে হইলে, অগ্রে দেখা উচিত প্রমাণ কয় প্রকার। এই প্রমাণ বলিতে আমরা বস্তুর প্রকৃষ্ট জ্ঞানের হেতু বুঝি। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই ত্রিবিধ প্রমাণ। বাহ্যবিষয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযোগে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহাই বাহ্য প্রত্যক্ষ। আর সূক্ষ্ম বিষয় (আন্তর ভাব) ও অন্তঃকরণ (মন, বুদ্ধি, অহং ও পঞ্চপ্রাণ *) সংযোগে (জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া) যে জ্ঞান হয়, তাহাই মানস প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৩। অনুমান—হেতু দ্বারা বস্তু নিশ্চয়, অর্থাৎ যুক্তি আশ্রয় করিয়া যে পশ্চাৎ জ্ঞান, যথা ধূম দেখিয়া অগ্নি নিশ্চয় ইত্যাদি।

৪। আগম—আপ্তবাক্য (বিশ্বস্ত পুরুষের বাক্য) যাঁহার বাক্যে কোন যুক্তির (অনুমানের) ও দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়া একবারে বস্তু নিশ্চয় (বা বিশ্বাস) হয়। কোন পুত্রের মাতা পুত্রকে বলিলেন, "ঐ গৃহে তোমার খাদ্যদ্রব্য ঢাকা আছে, লইয়া যাও"। পুত্র মাতার কথাতে বিশ্বাস করিয়া কোন প্রমাণের (দ্বিবিধ প্রত্যক্ষ ও অনুমান) অপেক্ষা না করিয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহে ঢাকা খুলিয়া খাদ্য পাইল। যেরূপ ঐ পুত্রের নিকটে ঐ মাতার বাক্য "আপ্তবাক্য", সেইরূপ ঋষিবাক্যে † নির্ভর করিয়া আমাদের যে বস্তুজ্ঞান হয়, তাহাই "আগম (শ্রুতি)"। ভিন্ন ভিন্ন বাদিরা আমাদের এই ত্রিবিধ প্রমাণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাঁহাদের প্রমাণের হেতু ইহারই অন্তর্ভুক্ত, চিন্তাশীল জ্ঞানী মাত্রেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ঐ ত্রিবিধ উপায় ভিন্ন আর কোন প্রমাণের হেতু নাই।

---

* সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ মহোদয় কৃত "সাংখ্যীয় প্রাণতত্ত্ব" গ্রন্থে এই পঞ্চ প্রাণ কি তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

† অভ্রান্ত দ্রষ্টা পুরুষের বাক্য। এই অভ্রান্ত দ্রষ্টাপুরুষ মাত্রেই ঋষি পদবাচ্য।

৫। এই পৃথিবীতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই আপন আপন মূল ধর্ম্মগ্রন্থকে আপ্তবাক্য (আগম=Revelation) বলিয়া থাকেন। আমরা সরল বুদ্ধিতে এই "আগম"= "আপ্তবাক্য"="Revelation" বলিলে কি বুঝি। এই আগম পদ উচ্চারণ করিলে আমরা কোন মানুষকৃত গ্রন্থ বুঝি না, স্বতঃই যেন আমাদের মনে হয় যে, কোন স্বাভাবিক নিয়মে এই সৃষ্টির আদিতে কোন আদি বক্তা পুরুষ হইতে যে প্রথমবাঙ্‌নিষ্পত্তি হইয়াছে, তাহাই। আর ঐ আদি বক্তা পুরুষ বলিলে, সরল বুদ্ধিতে মনে হয়, যেন ঐ পুরুষও উপর (স্বর্গাদিলোক) হইতে আমাদের ধর্ম্ম উপদেশ দিবার জন্যই আসিয়াছিলেন, এবং তিনি অভ্রান্ত, আমাদের মত ভ্রান্ত নহেন। তাই আমরা আগমকে অপৌরুষেয় অভ্রান্তও মনে করি। আমরা কেন? সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই একবাক্যে আপন আপন মূলধর্ম্মগ্রন্থকে অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বাক্য (Revelation) বলিয়াই স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। এত হইল সরল বুদ্ধির (বিশ্বাসের) কথা! আর্য দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের দিক্ হইতে দেখিলে ইহা কতদূর সত্য?—১৪।১৫ প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

৬। আর্যদর্শন একবাক্যে প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই সৃষ্টির মূলে এক অনাদি অনন্ত পূর্ণশক্তি কারণরূপে নিত্য বিদ্যমানা আছেন, ঐ শক্তিই পরিদৃশ্যমান বিশ্বরূপে সদা পরিবর্ত্তিতা (সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়) হইতেছেন, আর ঐ শক্তিপ্রভাবে সকল দ্রব্যই অভিব্যক্ত হইতে পারে, কিছুই অসম্ভব নহে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও এই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূলে ঐরূপ এক পূর্ণ শক্তি সমষ্টি থাকা স্বীকার করেন, এবং ঐ শক্তির প্রচলনই (motion or vibration is force) এই বিশ্ব (যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ)। এই শক্তিকে নাস্তিকেরা (atheist) বলেন, এই সৃষ্টি আপনা আপনি হয়, উহা ঈশ্বর নহে, কোন শক্তি থাকিলেও থাকিতে পারে। agnosticগণ বলেন, এই সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ, (অর্থাৎ The unknown entity)। আমরা যে বিষয়ে অজ্ঞ, যাহা জানি না, তাহা যে আদৌ কিছু বস্তু নহে, অভাব, একথা বলা যায় না। সতেরই (যাহা সত্তা অর্থাৎ যাহা আছে, তাহারই) অভিব্যক্তি হয়, এই স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি অনুসারে ঐ মূল কারণ যে সত্তা বা শক্তি তাহা স্থির হইল।

৭। সকল আস্তিক ঈশ্বরবাদী এই জগতের ঐ মূল কারণকে (ঐ মূলা শক্তিকে) একবাক্যে অনাদি অনন্ত পূর্ণশক্তিমান পরমেশ্বর বলিয়া থাকেন, এবং তাঁহার প্রভাবে এই বিশ্বসংসারে সকলই হইতে পারে, অর্থাৎ অতীতকালে ইহা হইয়াছিল, উহা হয় নাই, বর্ত্তমানে ইহা হইতেছে, উহা হইবে না, এবং অনাগত কালে ইহা হইবে, উহা হইবে না, এরূপ কোন বিধি নিষেধ চলে না। তবে আস্তিক খৃষ্টানাদির সহিত এই বিষয়ে আর্যশাস্ত্রের একটু মতভেদ আছে, তাঁহারা বলেন, "অভাব হইতে (কিছু না হইতে) ঈশ্বরেচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে", আর্যশাস্ত্রে বলে "সদ্ভাব (সত্তা) হইতে তাঁহার প্রভাবে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে"। এই মত দ্বৈধ, পরে মীমাংসা করা যাইতেছে।

৮। নাস্তিক (চার্ব্বাক্) ও বৌদ্ধসম্প্রদায় এইরূপ (আস্তিকের মত) পরমেশ্বর স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন যে, "আপনা আপনি মহা শূন্য হইতে কোন প্রভাবে স্বতঃ এই বিশ্বের বিকাশ ও লয় হইতেছে"। এ মন্দ সিদ্ধান্ত নহে। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি যে, এটি স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম, কোন ক্রিয়া (পরিণাম=কার্য্য) হইলেই তাহার মূলে কোন এক শক্তি থাকিবেই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে সকল প্রলচন (ক্রিয়া) মাত্রেই শক্তির গতি (vibration is force)। অতএব নাস্তিক ও বৌদ্ধমতে মহাশূন্য হইতে আপনা আপনি কোন প্রভাবে এই বিশ্বের বিকাশ হইলেও উল্লিখিত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণের দ্বারা উহার মূলে অবশ্য এক শক্তি থাকা সিদ্ধ হইতেছে। সেই শক্তি জড়া শক্তিই হউন আর চিচ্ছক্তিই হউন * (ঈশ্বরবাদীর চিন্ময় পরমেশ্বরই হউন)।

ভগবান্ বুদ্ধদেব শূন্যবাদী ছিলেন না। তিনি জীবের দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির উপায় ও নির্ব্বাণ মার্গই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী অল্পজ্ঞ বৌদ্ধদার্শনিকগণই শূন্যবাদ, অনাত্মবাদ, ক্ষণিকবাদ প্রভৃতি বৌদ্ধদর্শনশাস্ত্রে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেব ঐ সকল তত্ত্ব বিচার করেন নাই। এ জগৎ ঈশ্বরের কার্য্য নহে, কিন্তু অনাদি কার্য্য কারণ পরম্পরা এই সাংখ্য মত ভগবান্ বুদ্ধদেবেরও অনুমোদিত। বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিক ধর্ম্ম বলিয়া যাঁহাদের ধারণা আছে, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান †। ভগবান্ বুদ্ধের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণই ঐ শূন্যবাদ, অনাত্মবাদ প্রভৃতি মত প্রচার করাতেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আসিয়া ঐ মত উঠাইয়া দিয়া বেদান্তমত প্রচার করেন। অবতার ও মহাপুরুষগণ স্বমত প্রচার করিয়া চলিয়া গেলেই কিছু শতাব্দী পরে তাহার ব্যভিচার হয়। সকল মতই কালে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। বৌদ্ধমতও সেইরূপ হইয়াছিল, তাই শঙ্করাচার্য্য আসিয়া আত্মবাদ প্রচার করেন।

৯। এইখানে একটু ইঙ্গিত করা যাইতেছে যে, কি নাস্তিক, কি বৌদ্ধ, কি আস্তিক, কি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সকল বাদীকেই ন্যায়যুক্তি অনুসারে এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, মূল উপাদান কারণে (ঐ মূলাশক্তিতে) যাহা বিদ্যমান থাকিবে, তাহার কার্য্যেও তাহা থাকিবে; যেহেতু ঐ উপাদান কারণই কার্য্যরূপে (কার্য্যকারণের অতিরিক্ত নহে) পরিণত হয়। অতএব ঐ মূল উপাদান কারণের (মূলাশক্তির আর্ষদর্শনোক্ত প্রকৃতি পুরুষ) পরিণাম যখন এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় (বিশ্ব), তখন ঐ মূল উপাদানে যাহা বিদ্যমান আছে, এই কার্য্য বিশ্বেও তাহা থাকিবে।

কিন্তু এই বিশ্বে (ওজীবে) আমরা চৈতন্য (চিৎশক্তি) বিদ্যমান আছেন দেখিতে পাই, সুতরাং ঐ মূল কারণে (মূলাশক্তিতে) চৈতন্য বিদ্যমান থাকা সিদ্ধ হইল। সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শী

---

* সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ মহোদয়ের বৌদ্ধদর্শন ও আত্মপ্রবন্ধ "হিন্দু পত্রিকা" দ্রষ্টব্য।

† "বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি শীর্ষক" প্রবন্ধ (সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ মহোদয়ের) হিন্দুপত্রিকা দ্রষ্টব্য।

চিন্তাশীল পণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অসতের অভিব্যক্তি কেহ স্বীকার করেন কি ?—

১০। যদি বলা যায় যে, পুষ্পসারের (আতর প্রভৃতির) মতন দৃষ্ট পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর হইতে সারাংশ (সূক্ষ্ম জীবাত্মা) উৎপন্ন হইয়া অনন্তকাল স্থায়ী হন ? ইহাও ভ্রান্তযুক্তি, যেহেতু যাহা মূলে (উপাদান কারণে) নাই, (অসৎ—Nihil-ad rem) তাহার আবার উৎপত্তি কি ? আকাশকুসুমের ন্যায় অভাবের উৎপত্তি (সংভাব) কোন্ ধীর ব্যক্তি স্বীকার করেন ? —যাহা অভাব, তাহা চিরকালই নাই; সুতরাং তাহার কার্য্যও (From nothing comes out nothing) নাই, আর যাহা সৎ (ভাব বা আছে), তাহা চির দিনই আছে; এই সৎপদার্থেরই অভিব্যক্তি হয়, এই স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি, দর্শন ও বিজ্ঞান এক বাক্যে অনুমোদন করিয়াছেন; অতএব সতের (ভাব পদার্থের) উৎপত্তি হয়। এই যুক্তি বলে জীবাত্মা (চিৎশক্তি) মূল উপাদান কারণে ছিলেন না, পুষ্পসারের (আতরের) মত হঠাৎ উৎপন্ন হইয়া অনন্তকাল স্থায়ী হন, এমত ভ্রান্ত প্রমাণ হইল।

১১। যদি বলা যায় যে, প্রত্যেক মনোবৃত্তির মত ঐ জীবাত্মা প্রতিক্ষণে উৎপন্ন ও নাশ প্রাপ্ত হইতেছে, এইরূপে প্রতি জীবাত্মার প্রবাহ (ক্ষণিকবাদ) চলিয়াছে ? এযুক্তিও ভ্রান্ত, কারণ চিত্তবৃত্তি প্রতিক্ষণে উৎপন্ন হইলেও উহার মূলে চিত্তরূপ সৎ উপাদান কারণ বিদ্যমান থাকাতে ঐ বৃত্তি সকল প্রতিক্ষণে চিত্তে উঠিতেছে এবং চিত্তেই লয় হইয়া থাকিতেছে। তোমরা যাহাকে 'নাশ' (বৃত্তিনাশ) বল, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে এই 'নাশ' পদের অর্থই কার্য্যের কারণ প্রবেশ (লয়)। চিত্তে যে বৃত্তি সকল লয় হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি ? এই নাশ বলিতে যে, তোমরা ধ্বংশ (অত্যন্ত অভাব) বুঝ, তাহা নহে, দর্শন ও বিজ্ঞান মতে নাশধ্বংস নহে, নাশ কারণে লয় হইয়া থাকা। যাহা ধ্বংস (অত্যন্ত অভাব) হয়, তাহার পুনর্বিকাশ হয় না। কিন্তু তুমি বিশ বৎসর পূর্ব্বে যে বারানসী নগরী দেখিয়াছ, আজ কলিকাতায় বসিয়া এই বর্ত্তমান সময়ে সেই বারানসী নগরীর প্রত্যেক বিষয়ের স্মৃতি চিত্তপটে তুলিতে পারিতেছ, যদি ঐ নগরীর প্রত্যেক বৃত্তি ঐ বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিক্ষণে তোমার চিত্তে উঠিয়া একবারে ধ্বংস (অত্যন্ত অভাব) হইত, তাহা হইলে কি তুমি এই বর্ত্তমান সময়ে মনে ঐ সকল তুলিতে পারিতে ? ইহাতে বুঝ যে, সমস্ত বৃত্তিই তোমার চিত্তপটে অঙ্কিত বা লয় হইয়া থাকে, ধ্বংস হয় না। যখন প্রত্যভিজ্ঞা (পূর্ব্বদৃষ্ট, শ্রুত ও অনুভূত বিষয় স্মরণ) থাকে, তাহার বাধ হয় না, তখন কেমন করিয়া বলিতে পার চিত্তবৃত্তি সকলের অত্যন্ত অভাব (ধ্বংস) হয় ? যদি চিত্তের বৃত্তি সকল ধারাবাহিকরূপে চিত্তে আহিত (বিধৃত) থাকে, তাহা হইলে চিত্তও একভাবে থাকে, বদলায় না, (যেহেতু কার্য্য একভাবে থাকিলে তাহার 'কারণও একভাবে থাকিবে), অতএব ঐ চিত্তের অনুভব কর্ত্তা (জ্ঞাতা) জীবাত্মাও একভাবে বিদ্যমান থাকিবেন। ঐ জ্ঞাতা একভাবে না থাকিলে, ঐ অনুভূতি এক ভাবের হইত না। এই যুক্তিতে ক্ষণিকবাদ ভ্রান্ত প্রমাণ হইল।

১২। বৌদ্ধগণ মূলে ঐ অনাদি অনন্ত পূর্ণ শক্তি (আস্তিকের ঈশ্বর) না স্বীকার করিলেও "আগম" (আপ্তবাক্য) ও তাহার আদিবক্তা পুরুষ (ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ) স্বীকার করেন। আর্য দর্শন ও বিজ্ঞান সম্মত মূল উপাদান কারণ শক্তির গতি সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে অপ্রতিহত বলিয়া সর্ব্বপ্রকার কার্য্য (এই সৃষ্ট জগতে যত প্রকার কার্য্য কারণ ভাব বিদ্যমান আছে) উৎপাদন করিতে সমর্থ হন। (৬ষ্ঠ প্রস্তাব দ্রষ্টব্য)। বর্ব্বত্র সৎপদার্থের উৎপত্তি সিদ্ধ আছে, অসতের অভাবের উৎপত্তি সিদ্ধ নাই। পূর্ব্বোক্ত এই যুক্তিতে হিন্দুর আগমোক্ত লোক সংস্থান (স্বর্গ নরকাদি), জীবাত্মা ও তাহার কর্ম্মপ্রবাহ পুনর্জন্ম, মুক্তি, অবতার প্রভৃতি সকলই অনাদি কাল হইতে আছে, অর্থাৎ সৎপদার্থ সিদ্ধ হইতেছে। তাহা হইলেও ঐ ৬ প্রস্তাব আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধ ও অন্যান্য আস্তিক নিরাকার বাদীর মতে কিছুই ছিল না, ঐ জীবাত্মা প্রভৃতি শূন্য হইতে ঈশ্বর ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়াছেন। উক্ত মত হয় সত্য বলিতে হইবে ?—তাহা বলিতে পার না, কারণ ১০ প্রস্তাবে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, অসতের (অভাবের) উৎপত্তি হয় না। যাহা উপাদান কারণে (৯ম প্রস্তাব—মূলে) ছিল না, তাহার উৎপত্তি কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত স্বীকার করেন কি ? এই স্থানেই ঐ মতাবলম্বীগণ নিরুত্তর।

১৩। ঐরূপ যে এক (আর্য দর্শন ও বিজ্ঞানোক্ত) অনাদি অনন্ত পূর্ণ বস্তু (বাস বা অবস্থিতি বা সত্তা আছে যাহার, তাহাই বস্তু) বিদ্যমান (মূল উপাদান কারণ শক্তি) আছেন, তাহার আর একটী অখণ্ড যুক্তি এই যে, যে দ্রব্যের (বস্তু সত্তা) মধ্যে কোন সীমা (Line of dimarcation) নাই, তাহাই অনাদি অনন্ত হয়, আর এই অনাদি অনন্ত বস্তুই পূর্ণ হয়, যাহা পূর্ণ তাহাই একমাত্র নিত্য সত্তা। কোন এক দ্বৈত সত্তা (দ্বিতীয় বস্তু) আছে বলিলেই ঐ উভয় দ্রব্যের মধ্যেই সীমা আইসে এই সীমারেখাই দুই বস্তুকে সসীম করে; যেমন "ক" ও "খ" এই দুই বস্তু * আছে বলিলেই "ক" ও "খ" এর মধ্যে ব্যবধান (রেখা বাসীমা) আসিল †। আর সীমাযুক্ত (সান্ত) বস্তুই গতিশীল চলিয়া যাইতেছে, একক্ষণও

---

* দেশ কালাশ্রয় করিয়া এক বা দুই বা অধিক বস্তু থাকিলেই তাহা সান্ত হয়।

† কোন এক বৈদান্তিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত এক সময় আমাদের বলিয়াছিলেন যে, লৌহ খণ্ড অগ্নিতে দগ্ধ করিলে, যেরূপ ভাবে তাপ তাহার মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে, দ্বৈত সত্তা, সেইরূপ ভাবে মূল কারণে (ব্রহ্মে) আছে। এ দৃষ্টান্তও ভ্রান্ত। যেহেতু ঐ লৌহখণ্ডের প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে যে অবকাশ (space) আছে, ঐ অবকাশে তাপের পরমাণু ব্যাপিয়া থাকে, অর্থাৎ তাপ ও লৌহ পরমাণু স্বতন্ত্র স্বতন্ত্রই থাকে, অতি নিকট সন্নিবেশিত থাকায় ঐ লৌহখণ্ড অগ্নিময় (বা তাপময়) বোধ হয়। এই স্বতন্ত্রতাই সীমা-রেখা (line of demarkation) "সাংখ্যের ঐ পুরুষ বহুত্বের তত্ত্ব পুরুষের সহিত পরিচয় (নিজ স্বরূপ উপলব্ধি) হইলে বুঝিতে পারিবে। "গীতায় ঈশ্বর-বাদ" গ্রন্থে সাংখ্যের ঐ পুরুষ

সান্ত দ্রব্য (এই জগতে যাবতীয় পদার্থ) স্থির (এক ভাবে) থাকে না, যাহা একভাবে স্থির থাকে না, তাহাই মূর্ত্ত (মূর্ত্তিমান্)। আর এই মূর্ত্ত দ্রব্য মাত্রেই নাশ্য *। এটী ভূয়োদর্শন ও প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারায় সিদ্ধ হয়। অতএব এই যুক্তিতে এই মূর্ত্ত জগতের মূল উপাদান কারণ যে অনাদি অনন্ত এক এবং পূর্ণ, তাহা প্রমাণ হয়। আর এক পূর্ণ সত্তাই দেশ ও কালাতীত (The one without a second) সদা অচল, গম্ভীর, ধীর ও অবিকারী। যেহেতু তাহাতে অবিকাশ কোথায় যে, সচল ও ক্ষুব্ধ হইবে ?—আবার ঐ এক পূর্ণ শক্ত (চিৎ = পুরুষ = ব্রহ্ম) হইতে শক্তির প্রচলন হইলেও ঐ শক্ত অবিকারীই থাকেন। যথা—তোমার হস্তস্থিত শক্তি প্রভাবে ঐ নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র প্রচালিত হইলেও ঐ শক্ত (হস্ত) একভাবেই থাকে, হস্তের কোন বিকার বা ক্ষোভ হয় না। তুমি নিজেই ইহা অনুষ্ঠান করিয়া সত্যতা উপলব্ধি কর। অতএব পুরুষ' বা 'চিৎ' বা 'ব্রহ্ম' সত্তা হইতে মায়ার বা প্রকৃতির প্রচলন হইলেও ঐ শক্ত ('ব্রহ্ম') এক ভাবেই সদা (নিত্য) বিদ্যমান আছেন। যদি বল অনেক লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে শক্ত (হস্ত) অশক্ত হয়, তাহা বলিতে পার না, কারণ বাহ্যে যে স্থূল হস্তকে অশক্ত বলিতেছ, উহা সূক্ষ্ম কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্তের বাসস্থান মাত্র ; ঐ বাসস্থানের অশক্তিতে সূক্ষ্ম হস্তেন্দ্রিয়ের কোন বিকার বা শক্তি ক্ষয় হয় না। এই স্থূলশরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরের (ধ্যানাদি দ্বারা) স্বাতন্ত্রতা উপলব্ধি হইলে তবে ইহা বুঝিতে পারিবে।

বহুত্ববাদে দোষারোপ করা হইয়াছে। ইহার প্রতিবাদে আমরা বলি যে, নবীন বেদান্ত মতে যে, আত্মা আকাশের (ঘটাকাশ ও মহাকাশের ন্যায়) ব্যাপী প্রমাণ করা হইয়াছে, উহা কি ভ্রান্ত মত নহে ?—যেখানে ব্যাপ্তি ও ব্যাপক সম্বন্ধ আছে, সেইখানেই পরিমাণ (সীমা) আসিল, অর্থাৎ আত্মা-ব্রহ্ম এতখানি ব্যাপিয়া বা অতখানি ব্যাপিয়া (যাহার যতখানি লম্বা চওড়া ধারণা আছে) আছেন, এই সসীমত্ব আসিতেছে ; এই সসীম দোষ পরিহারের জন্যই সাংখ্যাচার্য্যেরা পুরুষ বা আত্মা বহু বলিয়াছেন। এই বহুত্ববাদ দেখিয়া অদ্বৈতবাদী প্রতিবাদ করিয়াছেন। দৈশিক ও কালিক সম্বন্ধ নিরোধ করিয়া স্ব স্বরূপে অবস্থিতি এখানে দ্বিতীয় নাই, আপনাতে আপনি থাকাই সাংখ্যের বহুত্ববাদ। যাবতীয় ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সান্ত, যেহেতু দেশকালে ব্যাপ্ত। আর ঐ ব্যাপ্তি (দেশকালাশ্রয়) হইতেই ইহাদের বহুত্ব, এবং বহু হইলেই মূর্ত্ত (কারণে লয় হয়) নাশ্য। এক্ষণে এই যুক্তিতে (যাঁহাতে দেশ কাল নাই) পুরুষের ঐ মূর্ত্ত বহুবাদ খণ্ডিত হইল। "আমি" "আমি" (individual self) স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চৈতন্য প্রবাহ প্রবাহিত হয় বলিয়াই ঐ বহু শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই "আমি" "আমি" প্রবাহের স্ব স্বরূপে অবস্থান (সমাধি সাধন দ্বারা) হইলে তবে ঐ ধাঁধা মিটিবে। বৈদান্তিকের একত্ববাদের (ব্রহ্মপূর্ণ ও এক) কোন প্রমাণ নাই। সাংখ্যযোগাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ মহোদয় কৃত "পুরুষ বা আত্মা) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

* পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ কারণে লয় হয়।

১৪। হিন্দু বলেন, বেদই সেই অপৌরুষের অভ্রান্ত আপ্তবাক্য ('আগম'), বৌদ্ধ বলেন, গৌতম বুদ্ধ ভাষিত ধর্ম্মপদ প্রভৃতি সেই অভ্রান্ত আদি বাক্য, খৃষ্টান বলেন, আমাদের বাইবেলেই সেই অভ্রান্ত (Revelation), ইসলাম বলেন, কোরাণই সেই ঈশ্বরের আদি বাক্য, ইত্যাদি নানা মত থাকাতে কোন্‌টী আদি অভ্রান্ত বাক্য (আগম), তাহা স্থির করা যাইবে? এ বিষয়ের মীমাংসা অতি সহজ। "আগম" ('Revelation') বলিতে পুঁথি বা গ্রন্থাবলী নহে; তাহা আদি বক্তা অভ্রান্ত পুরুষের প্রথম সত্য পূর্ণ যে বাঙ্‌নিষ্পত্তি। এপক্ষে সকল আস্তিক সম্প্রদায় একমত আছেন, সেইজন্য আর কোন যুক্তিপ্রদর্শন করিতে হইবে না। তবে কোন্‌টী সেই সত্য পূর্ণ আদি বাক্য, আর কে সেই আদি বক্তা পুরুষ ইহা স্থির করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে এই পৃথিবিতে কোন্ দেশে পণ্ডিত তত্ত্বদর্শী মানবের বসবাস হইয়াছিল, এবং সকল আস্তিক ধর্ম্মসম্প্রদায়েব মধ্যে কোন্ ধর্ম্মবক্তা পুরুষ সর্ব্বাগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ভূগোল ও ইতিহাস দ্বারা তাহা স্থির করিতে হইবে। ভূগোল ও ইতিহাস একবাক্যে প্রমাণ দিতেছে যে, এসিয়াখণ্ডে সর্ব্বাগ্রে তত্ত্বচিন্তক আর্য্যজাতি উত্তরমেরু হইতে আসিয়া বসতি করেন, এবং ঐ আর্য্যজাতির মধ্যেই সর্ব্বাগ্রে সেই আদি সত্যপূর্ণ অভ্রান্ত বাক্য ('আগম') ধ্বনিত হয়। ইহার পরে অপর দেশে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ দ্বারা সেই সেই দেশের মানবের অধিকারভেদে (গুণ কর্ম্মানুসারে) সেই আদি সত্যপূর্ণ বাক্য ('আগম') শাব্দত (যে দেশে যতটুকু প্রচার হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা) হইয়াছে। ভূগোল ও ইতিহাস আশ্রয় করিয়াই আমরা বর্ত্তমানে সকল দেশ, জাতি, ভাষা, ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-চক্রপরিবর্ত্তক (মহাপুরুষ বা অবতার), রাজ্য রাজা, সাম্রাজ্য সম্রাট্, দর্শনশাস্ত্র ও দার্শনিক, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকগণের পূর্ব্বাপর সময় নির্ণয় করিয়া থাকি; অতএব ঐ আদি বক্তা পুরুষ ও আগম সম্বন্ধে উহাই যথেষ্ট প্রমাণ হইল *।

১৫। ঐ আর্য্যজাতির মধ্যে যে আগম=("বেদ") প্রথম ধ্বনিত হয়, সেই 'বেদ'= বিদ্‌-ঢে-অল্ অর্থে জানা, বিশিষ্টরূপে বা মর্ম্মে মর্ম্মে জানা। কি জানা? না—বস্তুর স্বরূপ জানা। এই জানা পদার্থভেদে দ্বিবিধ, বাহ্য ও আন্তর জ্ঞান। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাহ্য বিষয় (মহাভূতাদি ও ভৌতিক পদার্থ), এবং অন্তঃকরণ ও আন্তর বিষয় (সুখ, দুঃখ, মোহ, ইচ্ছা, দয়া, প্রকৃতি, পুরুষ) সংযোগে যে জ্ঞান হয়, তাহাই বাহ্য ও আন্তর পদার্থের জ্ঞান। বাহ্যজ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাহ্যবিষয় সংযোগে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা চালিত জ্ঞান; যেহেতু বাহ্যদ্রব্য মাত্রেই শক্তির চলন বা কম্পন (পাশ্চাত্য ঈশ্বর অবিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকও এই মতটী অনুমোদন করেন)। এই প্রচলন দ্বারাই প্রতিক্ষণে বাহ্যদ্রব্য বদলাইয়া যাইতেছে। উক্ত

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয় তাঁহার এক গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন যে, "দশ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আর্য্যজাতির মধ্যে 'বেদ' শব্দিত হইয়াছে"। তাহা (শ্রুতিরূপেই) ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, খৃষ্ট জন্মের দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে লিখন প্রণালী ছিল না।

প্রমাণের দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জ্ঞান যদি পদার্থের বাহ্যস্বরূপ জ্ঞান হইয়াও পরিবর্ত্তনশীল জ্ঞান হয়, তবে ঐ বিদ্ ধাতুর অর্থ ধরিয়া পদার্থ সকলের স্বরূপ জ্ঞান কাহাকে বলিব ? না—স্থির শুদ্ধসত্ত্ব (বুদ্ধিতত্ত্ব) দ্বারা সমাধিতে বস্তুর (কি বাহ্য কি আন্তর পদার্থের) যে স্থির জ্ঞান হয়, তাহাই পদার্থসকলের স্বরূপ বা তত্ত্ব। এই তাত্ত্বিক জ্ঞান সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্বধর্ম্মসম্প্রদায়ের নিকটেই সমানভাবে প্রতিভাত হইয়া থাকে। এই তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ বাক্যই "আগম" ("বেদ"="শ্রুতি")। যদি তুমি ঐ সৎ আদি বাক্য বাছিয়া লইতে পার, তাহা হইলে কোন মতের সহিতই ভেদ দেখিতে পাইবে না। ঐ বেদোক্ত ২১৪টী পদার্থের সকল মতের সহিত একতা দেখাইতেছি, ইহাতে বুঝিতে পারিবে যে, সকল মত প্রকৃতপ্রস্তাবে এক। নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্ব স্ব ধর্ম্ম ও সাধনসম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকিলেও যাহা মূল ধর্ম্ম (বেদোক্ত ধর্ম্ম) তাহা প্রত্যেক মানবের নিকটেই একভাবে প্রতিভাত হইতেছে; ঐ মূল বেদোক্ত মোক্ষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইলে, তুমি নিজের সহিত সকল প্রাণির সমান উপমা ধারণ করিবে, অর্থাৎ তোমার প্রতি অন্যে যে ব্যবহার করিলে, তাহা তুমি ভালবাস না, যাহাতে তোমার বাহিরে (স্থূলশরীরে) ও অন্তরে (মনে) ক্লেশ হয়, তাহা তুমি অন্যের (সকল প্রাণির) প্রতি আচরণ করিবে না; সকল প্রাণিকে আপনার মত দেখিবে। ইহাই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম * ইহাই বেদের সনাতন ধর্ম্ম জানিবে। প্রত্যেক মানবের ইহা অনুমোদিত, এমন কি প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিকও এই সনাতন ধর্ম্ম (সকল প্রাণিকে নিজের মত দেখা) মানিয়া চলেন। ধর্ম্ম বিশ্বাস কথাটি অনেকেই অন্ধবিশ্বাস বলিয়া উড়াইয়া দেন, বস্তুতঃ বিশ্বাস কি অন্ধ ? আগম অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই ত্রিবিধ প্রমাণের কোনটী না কোনটী আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ঈশ্বর বিশ্বাস হইলে, তাহা সংশয় রহিত নিশ্চয় জ্ঞান হইবে; এই নিশ্চয় জ্ঞানই বিশ্বাস (মনের একাগ্রবৃত্তি); অতএব এই "বিশ্বাস" কেমন করিয়া অন্ধ হইল ? ঈশ্বরের কোন এক ভাব ব্যঞ্জক রূপের বা নামের বা গুণের চিত্তে স্থির জ্ঞান (অর্থাৎ চিত্তচাঞ্চল্য রহিত একাগ্র) হইলেই চিত্ত সমাহিত হয়, আর এই সমাহিত চিত্তেই অবিকারী স্থির জ্ঞান (বেদ) প্রতিভাত হইয়া যাবতীয় পদার্থের স্বরূপানুভব হয়। অনুষ্ঠান দ্বারা এই বিষয়টী প্রত্যক্ষ করিতে হয়। আর একটী বিষয়ে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের একতা দেখ, সকল সম্প্রদায়ই উপাসনা কালে হয় ঈশ্বরের নাম, না হয় রূপ (কোন মূর্ত্তি বা জ্যোতি), না হয়

* এই ধর্ম্ম=ধৃ—মে—মন্ অর্থে ধারণ; কি ধারণ ? বস্তুর মজ্জাগত গুণ ধারণ। প্রত্যেক মানুষের (মানুষ কেন ? জীবের) মজ্জাগত গুণ কি ? না চিচ্ছক্তি (যেমন অগ্নির মজ্জাগত গুণ দাহিকা শক্তি)। এই চিচ্ছক্তি হইতে সকল মানব ও জীবের প্রতি সমান উপমা ধারণ করা অথবা সকল প্রাণীকে নিজের মত দেখাই মূল ধর্ম্ম। বস্তুমাত্রের এই মজ্জাগত গুণই "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম" পদ বাচ্য। ইহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই; যেহেতু বস্তু মাত্রেরই এই মজ্জাগত গুণ হইতেই বস্তুত্ব। জড় পদার্থেও এই চিৎধর্ম্ম বিদ্যমান আছে।

কোন গুণ (যেমন তুমি বিভু ও করুণাময়) চিন্তা করিবেনই। এই নাম বা রূপ বা গুণ ভিন্ন উপাসনা হইতে পারে না, যতক্ষণ উপাসনা, ততক্ষণই নাম, রূপ, গুণ। আর এই নাম রূপ গুণ মাত্রেই সসীম ; (finite) অর্থাৎ যতদিন তোমার উপাসনা থাকিবে, ততদিন সাকার (finite নাম, রূপ গুণ) তোমার চিত্তে অঙ্কিত থাকিবে। তুমি নামে নিরাকর উপাসক বলিয়া নিজকে জানিলেও তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে (বিচারচক্ষে) তুমি সাকার উপাসক হইতেছ, এখানেও নিরাকার সাকার সকল সম্প্রদায় মধ্যেই উপাসনা ভাবের একতা দেখ। * আর একটী বিষয়ে সকলের একতা দেখাইতেছি, সকল সম্প্রদায় মুক্তি বলিয়া যে একটী পদ ব্যবহার করেন, যাহা লাভ করা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। যথা—মুচ্ ধাতুর অর্থমোচন (মুচ্ ভাবে ক্তি) ধরিয়া কিসের মোচন ? না দুঃখের এই দুঃখ বলিতে শারীরিক ও মানসিক, হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ত্রিবিধ (আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক) দুঃখই আসিতেছে, তাহার মধ্যে পাপ ও নরকাদির সকল যন্ত্রনাই থাকিল। আর এক বিষয়েরও একতা দেখাইতেছি, আর্য শাস্ত্রে জীব, আত্মা ও ব্রহ্ম বলিয়া যে তিনটী প্রধান বিষয় প্রতিপাদ্য হইয়াছে, তাহা প্রকারান্তরে নিরাকারবাদী খৃষ্টানও স্বীকার করিয়াছেন যথা—Father son and Holy Ghost হিন্দু বলেন, ঐ জীব (Son) ও আত্মা (Holy Ghost) এবং ব্রহ্ম (Father) একই। ইসলাম সম্প্রদায়ের মধ্যেও কোন মহাত্মা বলিয়াছিলেন যে, "আনেল হক্ মনসুর" (I am the God-mansur) ঐ সকল মতই হিন্দুর জীব, আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য। সকল আস্তিক মতে এক বাক্যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত আছে ; এবং তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে, ব্রহ্মচর্য্য, (রেতধারণ) সত্য, দয়া, অহিংসাদি পালন করিয়া পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়, সকল বাদীই তাহা মানিয়া আসিতেছেন। এখন বুঝিতে হইবে যে, যাহা প্রকৃত আগম (বেদ) তাহা একই।*

জৈবিক যন্ত্র যুক্ত জীবের সহিত তুলনায় ভূতাদিকে অপেক্ষাকৃত জড় ভাবাপন্ন বলা হয়। এই চিচ্ছক্তি বলেই আমরা পদার্থ বিচার করি, আপনাকে আপনি অনুভব করি (I am concious of myself)। এই চিচ্ছক্তি না থাকিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কে জানিত ? ভাল মন্দ সুখ দুঃখকে বিচার করিত ? কে বলিত এটী প্রস্তর জড় পদার্থ ? ইত্যাদি।

* "মূর্ত্তি উপাসনা এবং জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের সমন্বয়" গ্রন্থে ইহার বিশদব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। যখনই নাম, রূপ, গুণের অতীত আত্মতত্ত্বানুভব (তত্ত্বজ্ঞান) হইবে, তখনই উপাসনা নাই। ইহাই প্রকৃত নিরাকার পদবাচ্য। আর্যশাস্ত্র গৌরবার্থে এই নির্গুণ আত্মার স্তুতিকে নির্গুণ উপাসনা বলিয়াছেন। আর নাম, রূপ, (মুর্ত্তি) দ্বিবিধ, প্রথম নাম (মন্ত্র) ও রূপ (মুর্ত্তি) সত্য কল্পনা, অর্থাৎ দৃষ্ট অভ্রান্ত পুরুষ (ঋষি) যে নাম ও রূপ (মূর্ত্তি) প্রত্যক্ষ করিয়া

কোথায়ও কোন বাদির সহিত মত ভেদ নাই, তবে মানুষের বুদ্ধির মলিনতা দোষেই বিবাদ ও ভেদ দেখিতে পাও, এবং সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির (স্বমত চালাইবার) জন্যই ঐ বিবাদ ও মতভেদ দৃষ্ট হয়। আর এক কারণ, মূলতঃ প্রকৃত তত্ত্বের ভেদ না থাকিলেও প্রাকৃতিক নিয়মে এক এক দেশের সংস্থান ও জল বায়ু এবং মানবের প্রকৃতিগত ভেদ হইতে যেরূপ খাদ্য আচার ব্যবহার অনুকূল হয় মানব সেইরূপই আচরণ করিয়া থাকে। এই সাধন ও ধর্ম্মসম্বন্ধেও যে যৎকিঞ্চিৎ ভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা ঠিক সেই নিয়মেই হইয়াছে।

এখন সংশয় আমরা পদার্থের অসংখ্য জাতিভেদ দেখিতে পাই কেন? না—সেই মূল উপাদান শক্তি (সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি) হইতে গুণের অসংখ্য বিভাগ (প্রচলন)

গিয়াছেন, শিষ্য পরম্পরা যাহা প্রকৃত প্রস্তাবে চলিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ যাহার প্রকৃত বস্তু বা সত্তা আছে।

আর দ্বিতীয় প্রকারের নাম (মন্ত্র) রূপ (মূর্ত্তি) কেবল কবির মিথ্যা কল্পনা মাত্র, অর্থাৎ বস্তু শূন্য শব্দানুপাতি জ্ঞান মাত্র। যেমন "হে নগরাজ! তুমি চুম্বিছ গগন" ইত্যাদি।

* পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে "আগম" বা "বেদ" বলিতে নানা টীকা টিপ্পনী সহিত গ্রন্থ-রাশি (ছাপা বা হস্তলিখিত পুস্তকাদি) নহে। বিদ ধাতুর অর্থ লইয়া পদার্থমাত্রের স্বরূপের যে অবিকৃত জ্ঞান (যাহা সদাকাল) সকল মানবের নিকটে একভাবেই বর্ত্তমান আছে; ঐ জ্ঞান বস্তুর মজ্জাগত গুণের তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মানুষের গভীর হৃদয় প্রদেশে (বুদ্ধি তত্ত্বে) নিহিত আছে। যাহা পূর্ব্বাকালে আর্যগণ দ্বারা গীত ও শ্রুত হইত। মানব ক্রমে মন্দ-সত্ত্ব (স্মৃতিশক্তিহীন) হওয়ায় পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ দ্বারা ছন্দবন্ধ শ্লোকাকারে উহা লিখিত (নানা টীকাদি সহিত) হইয়াছে; ক্রমে নানা আচার্য্যের দ্বারা নানাভাবে যজ্ঞাদি (হিংসাপূর্ণ) গ্রন্থাকারে লিখিত হইয়া নানা ভেদ লক্ষিত হইতেছে। যদি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলামাদি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ঐ "আগম' ("Revelation") হইতে পদার্থতত্ত্বের (ধর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান, ঈশ্বরানুরাগ, মুক্তি, ঈশ্বর বিশ্বাস, ঈশ্বর ও বিশ্বের মূল উপাদান প্রভৃতির) একতা দেখিতে ও হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও, তাহা হইলে স্বীয় স্বীয় হৃদয়গহ্বরে বিচার-ইন্ধন দ্বারা জ্ঞানাগ্নি প্রজ্জ্বলিত কর; ঐ সত্য জ্ঞানাগ্নির উজ্জ্বলালোকে সকল বাদির বিরুদ্ধ মতের অন্ধকার দূর হইবে। সকলই এক দেখিতে পাইবে। কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কেই স্বমতের বিরুদ্ধবাদী মনে হইবে না। সকল সমাজ ও ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি আসিবে। ২৪৪৮ ও ৪২০ বর্ষ পূর্ব্বে ভগবান্ গৌতমবুদ্ধ ও ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য উপদিষ্ট "সর্ব্বজীবে দয়া" ও প্রগাঢ় ভালবাসা আসিবে, এবং সেই পরমেশ্বরে পরানুরক্তি হইবে। আর যদি ঐ জ্ঞানাগ্নির চরম জ্যোতি প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে এই বিশ্বসংসারে একবারে আত্মপরভেদ বুদ্ধি উঠিয়া যাইবে, সর্ব্বজীবে ব্রহ্মজ্ঞান হইবে, জগৎ জুড়িয়া জগন্নাথকে দেখিবে। ইহাই সাংখ্য ও বেদান্ত প্রতিপাদ্য অভেদাত্মজ্ঞান।

হয়, এই অসংখ্য বিভাগ বা প্রচলন হইতে অসংখ্য পদার্থ হইয়াছে; এবং প্রতি মানবের বুদ্ধি ও অহঙ্কারের (ভাবের-ধর্ম্মকর্ম্মের) ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা দেখিতে পাই। আমরা বলি বটে যে, সকল হিন্দুর, সকল বৌদ্ধের, সকল খৃষ্টানের সকল ইসলাম প্রভৃতির একপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান; কিন্তু তাহা নহে, ঐ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি মোটের উপর এক মতাবলম্বী হইলেও বস্তুতঃ তাঁহাদের প্রত্যেকের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মভেদ আছে। মনে কর এক ধর্ম্ম মন্দিরে এক সময়ে এক মতের উপাসক (হিন্দু বা বৌদ্ধ বা জৈন বা খৃষ্টান বা ইসলাম) ঈশ্বরোদ্দেশে একই স্তুতি সমস্বরে গান করিতেছেন, অথচ তাঁহাদের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা কর যে, তোমরা এই স্তুতির কে কি অর্থ অনুচিন্তন করিতেছ, বুঝিতেছ ও দেখিতেছ (যদি ঐ পদ সকলের বাহিরে দেখিবার কিছু বিষয় থাকে)? যদি প্রত্যেকে সরল ভাবে (নিজ নিজ মনের ভাব গোপন না করিয়া) উত্তর দেন, দেখিবে যে, ঐ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতি ব্যক্তির চিন্তার একতা নাই; সকলেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়াছেন, কেহ কিছু, কেহ কিছু ভাবিতেছেন, দুই জন ব্যক্তির কচিৎ তুল্যভাব লক্ষিত হইবে না। এইরূপ হয় কেন? এক ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া এক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলেই এক স্তুতি একস্থানে একই সময়ে একভাবে সমস্বরে ধ্বনিত করিতে করিতে সমভাব প্রাপ্ত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঢলিয়া পড়েন কেন? ইহাতে হয় বল, সকলে সমভাবে মনঃসংযোগ করেন নাই, ইচ্ছাপূর্ব্বক পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা করিয়াছিলেন; আর না হয় বল, উহাদের মূলে প্রত্যেক ব্যক্তির গুণকর্ম্ম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আছে, তাই সকলে স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক যে মন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন একথা বলিতে পার না; কারণ একভাবে মনোনিবেশ করিবার জন্যই এক সময়ে এক ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া সকলেই একই স্তোত্র গান করিতেছেন। অগত্যা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঐ দ্বিতীয় হেতু (সকলের মূলে গুণকর্ম্ম বিভাগ) হইতেই প্রতি ব্যক্তির ভাবের স্বতন্ত্রতা হইয়াছিল। স্বভাবই (আপন আপন ভাবই) বলবৎ। এই স্বভাব (স্ব স্ব গুণকর্ম্ম) হইতে যত মানুষ তত প্রকারের ভাব (ধর্ম্ম কর্ম্মের) সংস্থান আছে। এই জন্য হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রেও বেদে নানা মত দেখিতে পাও; যখন যে আচার্য্যের যেরূপ বুদ্ধিভেদ (গুণের সমাবেশ) হইয়াছে, তিনি সেইরূপ নিজ মত বিধি-বদ্ধ করিয়া চালাইয়া গিয়াছেন। এইরূপ মতভেদ (উক্ত কারণে) কেবল হিন্দুর কেন? বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ইসলাম প্রভৃতি সকল সর্ব্বসম্প্রদায় মধ্যেই আছে। ভিন্ন ভিন্ন গুণকর্ম্ম যে উহার কারণ সে পক্ষে আর কোন সংশয় রহিল না। পূর্ব্বে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের যে লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে, যে ধর্ম্ম মহাভারতে ভীষ্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-দর্পণে যদি প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায় নিজ নিজ মুখ দেখেন, তাহা হইলে সকল সম্প্রদায়ই পরস্পরকে ভালবাসিতে ও সহানুভূতি করিতে বাধ্য হইবেন, এবং মূলধর্ম্ম একই দেখিতে পাইবেন।

১৬। এখন সংশয় তুলিতে পার যে, মূলে প্রাকৃতিক নিয়মে যদি মানবের গুণ,

কর্ম্মভেদ হইল, তাহা হইলে আর্য্য শাস্ত্রোক্ত দৈব বা অদৃষ্ট ও পুরুষকার বাধ হইতেছে? হঠাৎ এই সংশয় আসে বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে, সামঞ্জস্য দেখিতে পাইবে। কার্য্যের হেতু অনাদি বিদ্যমান থাকিলে, তাহার কার্য্যও অনাদি বিদ্যমান থাকিবে, অর্থাৎ এই বিশ্ব সংসার সেই মূল কারণ হইতে লয় বিকাশ (ব্যক্তাব্যক্ত) প্রণালীতে প্রবাহরূপে (ধারাবাহিকরূপে) অনাদিকালই আছে ও চলিতেছে; অতএব মানব ও তাহার গুণকর্ম্মও অনাদি। "এই কর্ম্ম মাত্রেই কর্ত্তার (যে করে তাহার) অধীন, অর্থাৎ বর্ত্তমান পুরুষকৃতিই (কর্ম্মই) পুরুষকার; আর ভূত জন্মের পুরুষকৃত কর্ম্মই বর্ত্তমান জন্মে দৈব বা অদৃষ্ট। শাস্ত্রে অদৃষ্ট (যাহা দেখা যায় না, অর্থাৎ অতীত ও অনাগত কালের কর্ম্ম আর তাহাই দৈব) অর্থে ব্যবহার আছে। এই অদৃষ্ট বা দৈব (পুরুষের অতীত জন্মের কর্ম্ম সকলের সংস্কার) মানবের বর্ত্তমান জন্মের চেষ্টা ও কর্ম্মের হেতু বলিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের (স্বভাব) দ্বারা মানবের গুণকর্ম্ম বিভাগ আছে বলা হইয়াছে। আবার বর্ত্তমান জন্মের পুরুষকার ও সঞ্চিত (বহু অতীত জন্মের কর্ম্ম, যাহার ফলভোগ আরম্ভ হয় নাই) কর্ম্মের মিলন হইতে ভাবী জন্ম সূচিত হইবে; এই নিয়মে তাহাকেও প্রাকৃতিক নিয়ম বা স্বভাব বলা যাইবে। এইরূপ ধারাবাহিক সকল জীব ও তাহার কর্ম্ম ও গুণ চলিয়াছে। এই কর্ম্ম সকল হইতে মানবচিত্তে সংস্কার বীজ সঞ্চিত হয়, এই বীজ হইতে জন্ম, তির্য্যগ যোনি; নিরয় ও স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হয়। এই কারণে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, সংস্কার (বাসনা) ও কর্ম্মক্ষয়েই নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয়। যোগাদিদর্শনেও এই একই কথা, চিত্তবৃত্তিশূন্য (নিরোধ সমাধি) না হইলে কৈবল্য মুক্তি হয় না। সকলেরই একমত, তবে আমাদের বুদ্ধিভেদে পৃথক্ পৃথক্ মত বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা থাকিলেও বাধ্য হইয়া ঐ নৈসর্গিক নিয়মের অধীন; অগত্যা মানব পরাধীন (প্রাক্তনাধীন।)

১৭। কোন কোন বাদী বলেন; পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মজ সংস্কার হইতে যে বর্ত্তমান জন্মসূচিত হইয়াছে ইহার কোন প্রমাণ ও ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নাই। কোন্ যুক্তি আশ্রয় করিয়া উহা প্রমাণ করা যাইতে পারে? আর্য্যদর্শন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ন্যায়যুক্তি আশ্রয় করিয়াই মীমাংসা করা হইয়াছে যে, এই বিশ্বে কোন বস্তুর একেবারে নাশ (ধ্বংস) নাই, সকল দ্রব্যই সেই এক মূলাশক্তি (ঐ মূল উপাদান, "The one withont a second") প্রভাবে একবার আবির্ভাব একবার তিরোভাব হইতেছে; কোন বস্তুর অত্যন্ত অভাব হয় না। যখন কোন বস্তুর তিরোভাব (নাশ) হয়, তখন সেই বস্তু সেই অবস্থা হইতে আর এক অবস্থায় যায়; এইরূপে ঐ মূলাশক্তি প্রভাবে তাহার মধ্যে নানা পরিবর্ত্তন (ক্রিয়া বা প্রচলন) প্রতিক্ষণে চলিতেছে; এই পরিবর্ত্তনই জগতের (যাহা যায়, একভাবে থাকে না ও জীবের স্থূল শরীরের মৃত্যু (নাশ) । এই জগৎ বলিতে গম ধাতুর চলায়মান অর্থ ধরিয়া বস্তু মাত্রেই পরিবর্ত্তনশীল প্রমাণ হয়। হিন্দু শাস্ত্র, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের কত পূর্ব্বে এই জগৎ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্রেই মূলাশক্তির প্রচলন বা কম্পন (সাংখ্যের অহংকার ও অভিমান) হইতে বিকাশ

পাইয়াছে, (The whole universe is physical manifestation of the Energy) স্থির করিয়াছেন দেখ। এখন এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটী পরমাণু হইতে মানব অবধি (ব্রহ্মা ও ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত) সকলে বারবার যাইতেছেন ও আসিতেছেন নাকি? অতএব আর বলিতে পার না যে, জীবের পূর্ব্বজন্ম নাই। বেশ আমাদের পূর্ব্ব অস্তিত্ব ঐ যুক্তিতে থাকা সিদ্ধ হইল, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের বিষয় আমাদের স্মরণ থাকে না কেন *? ইহার উত্তরে

---

* মনে কর ইহজীবনেই আমরা অনেক সময়ে (মূর্চ্ছা, স্বপ্ন ও ভাবাবেশে) অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তাহার পরক্ষণে কিছুই স্মরণ করিতে পারি না, এরূপ বিস্মৃতির কারণ কি স্থির করিবে? তোমাকে বলিতেই হইবে যে, ঐ ঘটনার সময় আমাদের ইন্দ্রিয়াদি মস্তিষ্ক অবধি যেরূপ ভাবে অবস্থিত ছিল, তাহার পরক্ষণে বা এখন তাহা নাই, ঐ সময় কোন নূতন ভাব বা শক্তি আসিয়াছিল, এখন তাহার অভাব হইয়াছে, তাই বিস্মৃত হইয়াছি। আমরা ঐ নূতন শক্তি সমাগম বা কোন অন্তরায় (বাধা) বশতঃ ইহজীবনে অনেক ঘটনাবলী একবারে ভুলিয়া যাই, অতএব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিষয় বিস্মৃত হইব, কৌন্ বিচিত্র কথা? এটী অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, আমাদের বর্ত্তমান জীবনে কোন কোন মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মা বা তাড়িত শক্তি সঞ্চারক (mesmeriser) স্বীয় শক্তি সঞ্চার করিয়া তাহার অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়াদি অধিকার করত অনেক অলৌকিক ব্যাপার সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। ঐ প্রেতাবেশ বা তাড়িত শক্তি সঞ্চারিত অবস্থায় আবিষ্ট ব্যক্তিকে আবেশক কাগজ খাওয়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন সন্দেস খাইলে? উত্তরে আবিষ্ট ব্যক্তি বলিল, অতি উত্তম সন্দেস ইত্যাদি অনেক ঘটনা দেখিতে পাইবে, ঐ আবিষ্ট ব্যক্তির সেই একই আমিত্ব, সেই একই মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ হইতেছে, অথচ সে অপর ব্যক্তির ন্যায় বলিতেছে যে, "সত্যই আমি সন্দেস খাইতেছি", এই সকল ঘটনা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, উহার বাহ্য শরীরাদির কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও ভিতরে ভিতরে উহার অস্মিতা (আমার ভাব দেহাভিমান, বদলাইয়া গিয়াছে) change of personality আবার আবেশক স্বীয় শক্তি তুলিয়া লইলে সে ব্যক্তি প্রকৃতিস্থ হয়। কেহ কেহ বলেন যে, যদি ঈশ্বর ইহজন্মে আমাদের অতীত জন্মের পাপপুণ্যের দণ্ড ও পুরস্কার দেন, তাহা আমাদের স্মরণ না থাকায়, সে দণ্ড ও পুরস্কার দেওয়া না দেওয়া সমান কথা, এই কারণে পূর্ব্ব জন্ম বিশ্বাস করি না। পূর্ব্ব জন্ম উড়াইয়া দিবার ইহা প্রধান যুক্তি; ইহার আনুষঙ্গিক আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কটী কথা আছে। এই পূর্ব্বপক্ষ নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। ইহার উত্তর এক কথায় এই যে, সকল আস্তিক (ঈশ্বরবাদী)গণ ঈশ্বরের যে স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার সম্যক্ ধারণা ও অনুভূতি (introspection) হইলে, আর তাঁহাকে ঐরূপ দণ্ড ও পুরস্কারদাতা (ঈশ্বর) বলিয়া ভ্রান্তি আসিবে না। সকল আস্তিকের ও প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিকের মতেই এই বিশ্বসংসারের যিনি মূল কারণ, তিনি "একই" এবং সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তি সমষ্টি, (৬ষ্ঠ প্রস্তাব দ্রষ্টব্য) অধিকন্তু ইহার সহিত সর্ব্ব আস্তিকগণ তাঁহার জ্ঞানময় (omniscient) আখ্যা দিয়া থাকেন। প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিক যে সর্ব্বশক্তি

বল দেখি যে, আমাদের ইহজন্মের যৌবনকালে মস্তিষ্কাদি সকল ইন্দ্রিয় পূর্ণ বিকাশ হইলেও অনেক ঘটনা মনে রাখিতে পারি না কেন? একবারে বিস্মৃত হই কেন? এতদুত্তরে অবশ্যই বলিবে যে, কোন অন্তরায় (অশক্তি) বা কোন নূতন শক্তি (বা কোন নূতন ভাবাবেশ) বশতই ভুলিয়া যাই। সেইরূপ বিশেষ অন্তরায় (অশক্তি) বা কোন নূতন শক্তি (বা কোন নূতন ভাব) হইতে আমরাও পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের সকল বিষয় বিস্মৃত হই। মরণ ত্রাস হইতেও পূর্ব্বজন্ম থাকা প্রমাণ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বশ্রুত, দৃষ্ট এবং অনুভূত দুঃখের স্মরণ হইলেই প্রাজ্ঞ মানব হইতে অজ্ঞ সদ্যোজাত শিশু (সদ্যোজাত শিশু কেন? কীটাণু অবধি সকল প্রাণীই) মরণভয়ে ভীত হয়। এই মরণভীতিই অভিনিবেশ, এই অভিনিবেশের সংস্কার জীবের মর্ম্মে মর্ম্মে অনুবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, দীর্ঘকালের বহু কর্ম্মজ অভ্যাস হইতেই আমাদের সংস্কার জন্মায়, আর এই সংস্কার বীজরূপে চিত্তে আহিত থাকে, অর্থাৎ মনে অঙ্কিত হইয়া যায়; তাই অনেক কার্য্যে আমাদের ইচ্ছা না থাকিলেও আমরা স্বতঃ বাধ্য হইয়া পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ সেই সকল কার্য্য করি। এই যুক্তির সত্যতা মানবমাত্রেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অতএব এই যুক্তি বলে প্রমাণ হয় যে, আমরা (সকল জীবই) পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ অর্থাৎ অনেকবার জন্মিয়া মরিয়াছি, তাই ইহজন্মে না মরিলেও কোন একটি সামান্য শরীর দুঃখ (ব্যাধি) দেখিলেই মরণভয় (অভিনিবেশ) হয়, সুতরাং ইহাদ্বারা পূর্ব্বজন্ম থাকা সিদ্ধ হইতেছে।

কোন একটি সদ্যোজাত শিশুর হস্ত প্রথমে প্রদীপ শিখায় উপরে ধরিলে সে ভীত হইবে না; কিন্তু দ্বিতীয়বার যদি তাহার হস্ত ঐ দীপশিখায় ধরা যায়, সে ভয়ে হাত তথায় দিতে দিবে না, সরাইয়া লইবে, এই ভয়ের হেতু কি পূর্ব্ব দাহজনিত অনুভব নহে? সকল জীবের

সমষ্টি পদ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার মধ্যে ঐ জ্ঞানময় পদও পড়িল, ঐ জ্ঞান ও একটি শক্তি (চিৎ-শক্তি) মধ্যে পরিগণিত হল। এখন এই স্থানে এই গ্রন্থের ১৩ প্রস্তাব খাটাইয়া বল দেখি যে, ঐরূপ একমাত্র পূর্ণ শক্তিমান্ অচল গম্ভীর ধীর শুদ্ধ বুদ্ধ ঈশ্বরের দণ্ডধারী রাজা বা সম্রাটের মতন সচলতা (চিত্তবিক্ষেপ বা বিকার) হইতে পারে কি যে, তিনি আমাদের পূর্ব্বজন্মের পাপপুণ্যের জন্য সদা ব্যস্ত হইয়া চলায়মান চিত্তে দণ্ড পুরস্কার ব্যবস্থা করিতেছেন? রাজা বা বাদসার সচল বিক্ষিপ্ত চিত্ত আছে, তাই তিনি তাঁহার প্রজার দণ্ড পুরস্কার (নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই) ব্যবস্থা করিয়া থাকেন না কি? তোমাদের প্রতিপাদ্য ঐরূপ একমাত্র পূর্ণ মূল কারণে (ঈশ্বরে) বিক্ষিপ্ত চিত্ত ও স্বার্থ নাই, থাকিলে তিনি শাস্তি ও পুরস্কার বিধান করিতেন। * ঐ দেখ আর্যশাস্ত্রে সেই ঈশ্বরের কি স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,

* নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানে নাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তব॥

গীতা, ৫ম, ১৪।১৫ শ্লোক।

অভিনিবেশও (মরণভয়ও) ঐরূপ পূর্ব্ব সংস্কারজ। এক্ষণে ধীর বিজ্ঞ পাঠক এই অভিনিবেশ বিষয়টি অনুচিন্তন করিলেই পূর্ব্বজন্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ মূর্খ, কেহ পণ্ডিত, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ পথের ভিখারী, কেহ বা প্রাসাদবাসী সম্রাট ইত্যাদি জীবজগতের নানা বিচিত্র ভাব দেখিয়াও পূর্ব্ব-জন্ম থাকা সিদ্ধ হয়। যদি পূর্ব্বপক্ষ কর যে, ঈশ্বর ঐরূপ নানাভাবে জীবজগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই সৃষ্টি বৈচিত্র হইয়াছে তাহা বলিতে পার না। যেহেতু সকল ঈশ্বরবাদীই তাঁহাকে নিরপেক্ষ ও পরম করুণাময় প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এরূপ নিরপেক্ষ করুণাময় ঈশ্বর কি বিচিত্র সৃষ্টি রচনা করিয়া জীবকে নানাবিধ ক্লেশ দিতে পারেন? যদি বল আপনা আপনি এ সৃষ্টি বিচিত্রতা হইয়াছে, তাহাও বলিতে পার না, কারণ আপনা আপনি অর্থেই পদার্থের স্ব স্ব ভাবের (যাহার ভিতরে যাহা নিহিত আছে) অভিব্যক্তি; এই স্ব স্ব ভাবই জীব মাত্রের পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের সংস্কার বীজ, এই বীজ হইতেই ঐ সৃষ্টি বিচিত্রতা (অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের স্বাতন্ত্রতা) হইয়াছে; অতএব ইহা দ্বারাও পূর্ব্বজন্ম প্রমাণ হইতেছে।

কোন বাদীরা বলেন যে, পিতামাতা হইতে মানুষ গুণকর্ম্ম লাভ করে (Heredity course)। ইহার উত্তরে আমরা জিজ্ঞাসা করি,—সম্রাট নেপলিয়ন কোন বীরের General এর পুত্র ছিলেন?—সামান্ত ব্যবহারজিবীর পুত্র হইয়া তিনি কেমন করিয়া বীর অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন?—ইহাতে অগত্যা বাধ্য হইয়া বলিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্ব্ব জন্মকৃত গুণকর্ম্মই হেতু।

বহু বাসনাও (পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বীজের বহুত্ব) পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি বিভ্রমের অন্য এক হেতু। ইহ জন্মেই দীর্ঘকালে ও বহু কর্ম্মজ সংস্কার হইতেও চিত্ত বিভ্রান্ত হয়। এটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ গম্য। চিন্তাশীল ধীরব্যক্তি মাত্রেই নিজ নিজ জীবনের ইহজন্মের সমস্ত ঘটনা বলী (প্রত্যেক দিবসের) স্মরণ করিলে এই বিস্মৃতির সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আবার এই চিত্তের অন্তরায় (অশক্তি-চিত্তমল) ধারণা ধ্যানাদি (অষ্টাঙ্গ যোগ) অনুষ্ঠান দ্বারা দূর হইলেও কোন এক সংস্কার বীজে সংযম করিলে, পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হয়। ইহার ফল অনুষ্ঠান দ্বারা প্রত্যক্ষ কর। এখানে তর্ক যুক্তি নাই। হিন্দুশাস্ত্রে অনেক জাতিস্মরের উল্লেখ আছে। ভগবান্ কৃষ্ণ চৈতন্য, তাঁহার অতীত জন্মের উজ্জ্বল ছবি দেখিয়া দিবা রাত্র (অশ্রুজলে ভগবৎ বিরহে) ভাসিতেন। ভগবান্ গৌতম বুদ্ধেরও অতীত জন্মের জ্ঞান হইয়াছিল।

"ওঁ ঈশানস্তাপনাশং নিরতিশয় বিবেকধাত্মকোপাধিযুক্তং
নিত্যৈশ্বর্য্যাঢ্য চিত্রং ভুবনময় মলং যস্য সম্বোধনেন।
কৈবল্য স্থানযুক্তং গুণমল রহিতং তং কৃপাকল্পবৃক্ষম্
শ্রদ্ধা বীর্য্য প্রজাত স্মৃতি মুদিত হৃদো ধীমহি শ্রেয়সে নঃ॥"

৮ "যিনি ঈশান, তাপনাশক, নিরতিশয় বিজ্ঞানাত্মক উপাধি যুক্ত, যাঁহার নিত্য ঐশ্বর্য্য সকলকে ত্রিভুবন রূপ চিত্র ও সম্যক্ বুঝাইতে সমর্থ নহে; সেই কৈবল্য স্থান যুক্ত, গুণমল রহিত, কৃপাকল্প বৃক্ষ ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা বীর্য্য প্রজ্ঞাত স্মৃতি মুদিত হৃদয় আমরা আমাদের পরমার্থের জন্য ধ্যান করি"। তোমার কৃত ভাল মন্দ উভয়বিধ কার্য্যেই তিনি মধ্যস্থ (উদাসীন), অতএব সদা তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে বিরাজমান আছেন। তোমার পূর্ব্বজন্ম কৃত পাপ পুণ্যের ফলভোগ ইহজন্মে স্মরণ থাক্ বা নাই থাক্, তাহাতে ঐ পূর্ব্বজন্মের বাধ হইবে কেন? আমাদের কৃতকর্ম্মের (ক্রিয়ার) পরিণাম (সংস্কারবীজ) হইতে এই শরীর; সুতরাং সেই পূর্ব্বস্মৃতি এই পাপ করিয়াছিলাম, তাহার দোষে এই জন্মে এই দুঃখ ভোগ করিতেছি, এই পুণ্য করিয়াছিলাম, তাহার গুণে এই সুখভোগ করিতেছি ইত্যাদি স্মরণ না থাকায় ঐ ক্রিয়া পরিণামের (সংস্কার বীজের) বাধ হইবে কেন?

১৮। এই প্রস্তাবে কোন মহাপুরুষ বা অবতার সম্বন্ধে কিছু বলিলে অপ্রাসাঙ্গিক হইবে না, যেহেতু এই গ্রন্থের নামই "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম" (এই ধর্ম্ম পূর্ব্বে ১৫ প্রস্তাবে উক্ত হইয়াছে) ও "অবতারবাদ"। যখন বঙ্গ-ভাষায় এই গ্রন্থ লিখিত হইতেছে, তখন অতি অল্প দিন (৪২০ বর্ষ) পূর্ব্বে যে মহাপুরুষ এই বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার বিষয়ই কিছু বলা যাইতেছে। "সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ" গ্রন্থে কি কি ভাবে ভগবানের অবতার হইতে পারে, তাহা স্ফুটীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে মহাপ্রভু সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি,—তিনি একজন ভগবদ্ভক্ত কি অবতার ইহাই বিচার্য্য? (ক) পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই জগতের মূলে সর্ব্ববাদী সম্মত একই নিত্য কারণ বিদ্যমান (৬ প্রস্তাব) আছেন, তিনিই আস্তিকের সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব শক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ পুরমেশ্বর। (খ) তাঁহার সত্তা বিদ্যমানতা হইতে বিশ্বে সকল প্রকার উৎপত্তিই সম্ভব, যেহেতু তাঁহার বিদ্যমানতা প্রভাবে সর্ব্বোৎপত্তি সম্ভব না হইলে, তাঁহার পূর্ণত্বের বাধ হয়, তাহা হইলে তিনি অপূর্ণ এবং ক্ষুদ্র শক্তিমৎপ্রতিপন্ন হন। কিন্তু তোমরা (সকল আস্তিক, নাস্তিক ও বৈজ্ঞানিক) এক বাক্যে বলিয়াছ, তিনি (মূল কারণ) সর্ব্বব্যাপী (all pervading) এবং সর্ব্বশক্তিমান (allmighty), অর্থাৎ সর্ব্বশক্তির বীজ এক মূলা শক্তিতে নিহিত আছে। সর্ব্বশক্তি থাকিলেই চিতি শক্তিও থাকিবে পূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে। এই স্থানে একটী পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে, কোন কোন হিন্দুশাস্ত্র ও খ্রীষ্টানাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তাঁহার ইচ্ছায় বা আজ্ঞামাত্রে সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু তাহা না বলিয়া, তাঁহার সত্তা (বিদ্যমানতা) প্রভাবে সকল সৃষ্টি হয়, এরূপ বলা হয় কেন? এ বেশ আপত্তি তুলিয়াছ। ইহার উত্তরে বল দেখি যে, ইচ্ছা ও আজ্ঞা অন্তঃকরণের বৃত্তি কিনা? যাঁহার তোমার মতন রাগ দ্বেষাদি পঞ্চক্লেশ (এবং পঞ্চচিত্তবৃত্তি) আছে, তাঁহাকেই ইচ্ছা ও আজ্ঞা করিতে হয় নাকি? যেখানেই অভাব, সেইখানেই দুঃখ ও সুখ, আর যেখানে ঐ দুঃখ ও সুখ, সেই খানেই ইচ্ছা ও আজ্ঞা আছে। (গ) এখন একটু

ধীরভাবে চিন্তা করিয়া নিজ নিজ অন্তর হইতেই বুঝ যে, যিনি পূর্ণ, যাঁহাতে কোন অভাব স্থান পায় নাই, এবং যিনি নিরবচ্ছিন্ন সুখের উৎস স্বরূপ তাহাকে কি অপূর্ণ জীবের মতন সৃষ্টিকার্য্যে ইচ্ছা * ও আজ্ঞা † করিতে হয়? আর যদি তাহাই করিতে হইল, তাহা হইলে

---

* সংশয় হইতে পারে যে, আর্য দর্শন (ন্যায়দর্শন) ও ভক্তিশাস্ত্র যে স্থানে,—এই সৃষ্টি-কার্য্যকে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও লীলা বলিয়াছেন, তাহাও কি ভ্রান্ত মত? "ইচ্ছা" ও "লীলা" বলিলেই একটীর পর আর একটী এইরূপে ঐ ইচ্ছা ও লীলাবৃত্তির প্রবাহ চলিতে থাকে, এবং অপূর্ণ জীবেরই তাহা হয়, এই জন্য ন্যায় দর্শনে ও ভক্তিশাস্ত্রে ঐ "ইচ্ছা" ও "লীলা" নিত্য বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে, অর্থাৎ "নিত্য ইচ্ছা" এবং "নিত্যলীলা" পদ ব্যবহার আছে। আর এই "নিত্য" শব্দ ব্যবহার করিয়া, ঐ দুই আর্য শাস্ত্রই উল্লিখিত মতের সহিত (নিত্য সত্তা বা বিদ্যমানতা হইতে বা প্রভাবে এই সৃষ্টি হইয়াছে) একতাই দেখাইয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। যেহেতু ইচ্ছা বা লীলা প্রবাহরূপে (একটীর পর আর এককটী) চলায়মান, আর এই চলায়মান বলিতে প্রচলন বা কম্পন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুমোদিত এক মূলাশক্তির প্রচলন, (Vibration of the Energy); ইহাই সাংখ্যাদি দর্শন শাস্ত্রের অভিমান, অহঙ্কারের প্রচলন, এবং এই প্রচলনই এখানে ইচ্ছা বা লীলা, ইহা প্রতিক্ষণ বদলাইয়া গেলেও ইহার সহিত যে, নিত্য শব্দ সংযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে ঐ এক মূলা শক্তিকেই লক্ষ্য করা হইতেছে; যেহেতু এই সৃষ্টিতে আর এমন কি দ্বিতীয় বস্তু আছে, যাহা সদাকাল এক ভাবে থাকে (নিত্য) বদলায় না অথচ প্রচলন হয়? অতএব সাংখ্যাদি দর্শন ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলে আমরা বলিতে বাধ্য আছি যে, এই জগতে সেই একমাত্র মূলা শক্তিই (The primordial Force) সদা একভাবে থাকেন; অতএব ঐ এক নিত্য সত্তা হইতে বা প্রভাবে এই সৃষ্টি হইয়াছে, উক্ত মতদ্বয় দ্বারাও প্রমাণ হইতেছে। বস্তুতঃ উহা (ইচ্ছা ও লীলা তোমার আমার মতন) চিত্তবৃত্তির প্রবাহ নহে। মূলাশক্তির প্রচলন, অর্থাৎ নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য লীলা। বাইবেল ও কোরাণে যে, ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, "জগৎ উৎপন্ন হউক, অমনি জগৎ হইল", এই ইচ্ছা পদের অর্থ যদি ঐ মূলা শক্তির প্রচলন ধরা যায়, তাহা হইলে সকল বিবাদই মিটিয়া যায়। সকল বাদীই একমতাবলম্বী বেশ বুঝিতে পারা যায়।

† ঐ নিয়মে আজ্ঞা ও (হুকুম) প্রবাহ (বৃত্তির পরবৃত্তি) অতএব ঈশ্বর হুকুম করিলেন "আলোক হউক ("Let there be light and there was light") অমনি আলোক হইল", এইরূপ তাঁহার হুকুম (আজ্ঞা) প্রবাহ চলিতে পারে নাকি? তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, ইহা তাঁহাতে সম্ভব বটে, কিন্তু উক্ত মতাবলম্বীগণ বলিয়াছেন যে, এই সৃষ্টির পূর্ব্বে এক মহা শূন্য (অভাব) ছিল, সেই মহাশূন্য হইতে তাঁহার (ঈশ্বরের) আজ্ঞায় এই সৃষ্টি; অথাৎ অভাব হইতে এই ভাবরূপ সৃষ্টি বিকাশ হইল (From nothing comesout something ১৩ প্রস্তাব)। তাঁহারা এই ন্যায় যুক্তি বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া, ঐ মত

তোমাদের অনুমোদিত তাঁহার পূর্ণতা ও মহিমা (ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরতা) কোথায় ? সুতরাং তুমি অগত্যা বাধ্য হইয়া বলিবে যে, তাঁহার সত্তা (বিদ্যমানতা) হইতেই স্বতঃ এই সৃষ্টি বিকাশ হইতেছে। এ সিদ্ধান্ত কি শ্রেষ্ঠ ও নির্দ্দোষ নহে ? (গ) পূর্ব্বেই সকলবাদী, আর্য দার্শনিক ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, উপাদান কারণই (মূলাশক্তির প্রচলনই) কার্য্যে পরিণত হয়। এই যুক্তিতে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সৃষ্টিতে দ্বিতীয় সত্তা (বিদ্যমানতা) না থাকায় ঐ একই মূলকারণ এই সৃষ্টিকার্য্যের উপাদান হইতেছেন। অতএব ঐ উপাদান (আস্তিকের ঈশ্বর, দার্শনিকের ও বৈজ্ঞানিকের মূলাশক্তির প্রচলন) যাবতীয় ভূতভৌতিক সৃষ্ট পদার্থেই অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন ; তাহার এই অনুপ্রবেশ হইতে আগমে (শ্রুতিতে) ধ্বনিত হইয়াছে, "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" (The universe is God)। এখন

সদোষ। ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম যে, শূন্য হইতে শূন্যই হইতে পারে, কি আর্যদর্শন কি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এক বাক্যেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, যাহা কোন দ্রব্য নহে তাহা হইতে কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। অসতের (অভাবের) বস্তুত্ব কুত্রাপি সিদ্ধ নাই। অতএব ঐ মতাবলম্বীরাই বলুন উহা যুক্ত কি অযুক্ত ? এখন দেখান হইতেছে যে, সকল মতেই তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহাতে সকল সম্ভব হইলেও এটীও স্বতঃসিদ্ধনিয়ম যে, কর্ত্তাকে চেষ্টা বা সঙ্কল্প (ইচ্ছা বা আজ্ঞা) করিয়া সকল কার্য্যকারণ ভাবই সাধন করিতে হয়, কিন্তু ঐ কর্ত্তার কোন স্বার্থ ও অভাব মূলে না থাকিলে ঐ চেষ্টা বা সঙ্কল্প (ইচ্ছা বা আজ্ঞা) আসিবে কেন ? উহাঁরাই বলুন, ঐ কর্ত্তার (ঈশ্বরের) ঐরূপ কোন স্বার্থসিদ্ধি ও অভাব আছে কি ? যদি তাহা থাকে, তাহা হইলে একদিন তিনি ঐরূপ ইচ্ছা বা আজ্ঞা করিয়া শূন্য (অভাব) হইতে এই ভাবরূপ সৃষ্টি উৎপাদন করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, তাঁহাতে কোন স্বার্থ ও অভাব নাই। যদি বলা যায় যে, জীবের (মানবের) কল্যাণ সাধনের জন্য (পরার্থে) তিনি অভাব হইতে এই ভাবরূপ সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন ? ইহাত আরও অযুক্ত সিদ্ধান্ত, কারণ অভাব হইতে অসংখ্য জীব ও মানব সৃষ্টি করিয়া তাহাদের বৃথা দুঃখ দিয়া তাঁহার কি উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে ? ইহাতে নিরীশ্বরতাই প্রকাশ পায় নাকি ? এখন যদি আর্য শাস্ত্রাদির মত ঐ বাদীরা বলেন, যে, তাঁহার নিত্য সত্তা (বিদ্যমানতা) হইতে (বা প্রভাবে) স্বতঃই এই বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে, অথচ তাঁহার স্বরূপের কোন চ্যুতি (ব্যতিক্রম) হয় নাই, তাহা হইলে তাঁহার প্রকৃত ঈশ্বরতা (মহিমাই) সিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও এই মত অনুমোদন করিয়াছেন, অর্থাৎ এই সৃষ্টি কার্য্যে মূলা শক্তি নিযুক্তা থাকিলেও তাঁহার স্বরূপ একভাবে আছে, কেবল তাঁহার প্রচলচনমাত্রই এই সৃষ্টীর যাবতীয় পদার্থ। এই প্রচলনে মূল দ্রব্যের (মূলা শক্তির) স্বরূপ চ্যুতি হয় না, উহা একই ভাবে থাকে। বিজ্ঞান আর্য দর্শন সম্মত এই মত শ্রেষ্ঠ নহে কি ? যে ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মত (সাংখ্যের অভিমানাত্মক =প্রচলনাত্মক সৃষ্টী) বিজ্ঞান সম্মত তাহাই সত্য ॥

ঐ ক, খ, গ,* যুক্তিত্রয় আশ্রয় করিয়া তোমরাই বল, ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য বা আর্ষশাস্ত্রে যে কোন অবতারের উল্লেখ আছে, (আর্ষশাস্ত্র কেন? যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে অবতার বা কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছে) তিনি ভগবানের ভক্ত কি অবতার? এই মীমাংসার পূর্ব্বে পূর্ব্বপক্ষ করিতে পার যে, তাহা হইলে সকল মানবই ত (সকল মানব কেন? সকল জীবই কি) অবতার* ? অবশ্যই ক, খ, গ যুক্তিতে তিনি সকলেই (মানব ও জীবে) অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন; কিন্তু বিশেষভাবে অবতীর্ণ হন নাই। ঐই বিশেষ-ভাবে অবতারের বিষয় "সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ" গ্রন্থে স্বর্গাদি লোক হইতে সারূপ্য, সালোক্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য মুক্ত পুরুষের যে অবতরণ উক্ত হইয়াছে, তাহাই। সাধারণ মানুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কৃষ্ণকর্ম্ম হইতে মন্দসত্ত্ব (মলিন ভাবাপন্ন); বিশেষ ভাবাপন্ন মানুষের শুক্লকর্ম্ম (তপস্যা, স্বাধ্যায়, সমাধি সাধন) দ্বারা অন্তঃকরণের যে বিভূতি (ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য) তাহা সাধারণ মানুষেও অপর জীবে নাই, সুতরাং তাহারা অবতার পদবাচ্যই নহে, যখন এই সংসারে পাপ বহুল হয়, মানব ও জীব জগৎ নানাপ্রকারে দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তখন করুণা পরবশ হইয়া ঊর্দ্ধলোক হইতে কোন মুক্তাত্মা, জীবের কল্যাণ সাধনের জন্য আসিয়া থাকেন।† সকল দেশে সকল জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ঐরূপ পুরুষের আবির্ভাব হয়। বিভূতির তারতম্যানুসারে কে ভক্ত, কেহ অংশ এবং কেহ বা পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। যে যে মহাপুরুষে ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য

---

* যেরূপ সামান্য ভাবে সকল পদার্থেই সূর্য্য কিরণ বিকিরণ করিলেও সকল পদার্থ হইতে সূর্য্য প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় না, দর্পণাদি হইতেই প্রতিফলিত হইয়া থাকে; সেইরূপ বিশেষ ভাবই (মুক্ত পুরুষ বা ঈশ্বরের প্রতিফলন) বিশেষ জীব শরীর হইতে হয়, সকল মানব (বা জীব) শরীরে হয় না।

† "সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ" গ্রন্থ এই অবতার সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য॥ এই গ্রন্থ ২০ প্রস্তাব ১৭।১৮ পংক্তি পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলেন যে, এইখানে অবতারকে ছোট করা হইয়াছে। বস্তুতঃ ঈশ্বরে ও সাজুয্য মুক্ত পুরুষে কোনু ভেদ নাই। ঐ অবস্থা স্ব স্বরূপে অবস্থিতি; অতএব পূর্ণই প্রকৃতিযোগে অবতীর্ণ হন। ঐ পূর্ণ কেবল, অখণ্ড ও একরস, অর্থাৎ সৎ চিৎ মাত্র; এই "সৎ চিৎ" মাত্রকেই নিখিল আর্ষশাস্ত্র এবং শ্রুতি পূর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, আর ঐ স্ব স্বরূপাবস্থিতি (সাজুয্য মুক্ত পুরুষ) ভেদরহিত একই সত্তা (সৎ চিৎ) মাত্র; অতএব সাজুয্য মুক্ত পুরুষ অবতরণ ও পূর্ণব্রহ্ম অবতরণ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে সমাধি সাধন (ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ) প্রয়োজন হয়। কেবল তর্ক যুক্তি ও শাস্ত্র দ্বারা বিজ্ঞান হয় না। উপনিষদের পূর্ণ ব্রহ্ম নির্গুণ এবং সাংখ্যের মুক্ত পুরুষও নির্গুণ। সাংখ্যমতে ঐ নির্গুণ পুরুষ অবতীর্ণ হন না। সগুণ ঈশ্বর (প্রকৃতিযুক্ত পুরুষ বিশেষ) সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত এবং তিনি অবতীর্ণ হইতেও পারেন; ইহাই সাংখ্য ও যোগমত।

সম্পূর্ণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাঁহারাই ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার (অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্ত পুরুষ আসিয়াছিলেন)। কে ভক্ত, কে অংশ, এবং কেইবা পূর্ণ জানিবার আর এক উপায়, আমরা কেহই অতীত কালের কোন মহাপুরুষ বা অবতার দেখি নাই, যেরূপ অতীত কালের সম্রাট্‌গণের মধ্যে কে ছোট কে বড় স্থির করিতে হইলে, ইতিহাসের উপরে নির্ভর করিতে হয়, সেইরূপ অতীত কালের মহাপুরুষ ও অবতারগণের জীবনী ও ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্যের তুলনা করিলে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ইহাতেও পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, ঐজীবনী লেখক ঐতিহাসিকগণ অনেক সম্রাট, মহাপুরুষ এবং অবতারের চরিত্রকে স্বীয় স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া নির্ম্মল চরিত্রও মলিন, এবং হীনচরিত্রও পবিত্র বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এই কারণে মহাপুরুষ বা অবতারের প্রকৃততত্ত্ব কি করিয়া বুঝিব ? কোন উদার নিরপেক্ষ ধর্ম্মাত্মা জ্ঞানী পুরুষ, যিনি প্রকৃতভাবে অনুভব করিয়া সকল ধর্ম্ম ও ধর্ম্মচক্র পরিবর্ত্তক মহাপুরুষ এবং অবতারগণকে সমভাবে দেখেন, তাঁহার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া কে ভক্ত, কে মহাপুরুষ, কে অবতার কে অংশ বা পূর্ণ স্থির করিতে হয়।

কেহ কেহ বলেন, যদি মহাপ্রভু চৈতন্য অবতারই হন, তবে তাঁহার সমদৃষ্টি কৈ ? কোন সময় তাঁহার কোন ভক্ত (মুরারী) "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য বলাতে, তিনি তাহার ভাতে প্রস্রাব করিয়া দিয়া ছিলেন, এই কি মহাপুরুষ বা অবতারের লক্ষণ ? ইহার উত্তর, যাঁহার "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য জ্ঞান হইবে, তাহার সুখে দুঃখে, শুভাশুভে, শীতোষ্ণে, মানাপমানে, বিষ্ঠাচন্দনে সমজ্ঞান হইবে, তাহা যাঁহার না হইয়াছে তিনি যদি ঐ মহাবাক্যোচিত কপটচারী হন, তাঁহার ভয়াবহ পরধর্ম্মের চর্চ্চা করা হয় নাকি ? "আমি সেই ব্রহ্ম," "আমাকে পাপপুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না," এই দোহাই দিয়াও অনেকে গীতার অনাসক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের দোহাই দিয়া, কত পাপ ও কদাচার করিতেছেন, ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এই ব্যভিচার নিবারণের জন্যই মহাপ্রভু ঐরূপ আচরণ (অর্থাৎ ভক্তকে শাসন) করিয়া ছিলেন। ছোট হরিদাস বর্জ্জন এবং গোবিন্দ ঘোষ বর্জ্জনও ঐরূপ সন্ন্যাস ধর্ম্মে যে ব্যভিচার হইতেছিল, তাহার শাসন। সন্ন্যাসী অষ্টমৈথুন বর্জ্জন করিবেন, সঞ্চয়ী হইবেন না। এই দুই কারণে ছোট হরিদাস ও গোবিন্দ ঘোষ বর্জ্জিত হইয়াছিলেন ; এজন্য অনেকে মহাপ্রভুর উপরে "তিনি নির্দ্দয়" বলিয়া দোষারোপ করেন। বস্তুতঃ সন্ন্যাসের কঠোর বিধি অনুসারে তিনি যথাযথ কার্য্যই করিয়া ছিলেন। ঐরূপ লোক শিক্ষার জন্য ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবী ও লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া ছিলেন। আবার অনেকে মহাপ্রভুর উপরে দোষারোপ করেন যে, তিনি কাপুরুষের ও ভীরুর "হরি বোলা" ধর্ম্মোপদেশ দিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন, আমাদের সাহস বীর্য্যহীন করিয়াছেন। ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, তিনি যখন প্রাণ ভরিয়া "হরি" বলিয়া ছিলেন, তখন বনের হিংস্র ব্যাঘ্র ও বীজলি খাঁর ন্যায় দুর্দ্দমনীয় পাঠানও উন্মাদ হইয়া নৃত্য করিয়াছিল। তোমরা সেইরূপ প্রাণ গলাইয়া সদ্ভাবে হরি বল দেখি, হিংসা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত বৈষ্ণব হও দেখি. সর্ব্বত্র অভয়

পাইবে, তোমার যে ভীষণ শক্র সেও তোমার বশীভূত হইবে। কাহারও মতে মহাপ্রভু যদি অবতারই হন, তবে দিবারাত্র "হরি হরি" বলিয়া পাগলের মতন কাঁদিতেন কেন? ভগবদ্‌বিরহে যে আক্ষেপ তাহা ভক্তেরই হইয়া থাকে? ইহার উত্তর, মন্দসত্ত্ব দুর্ব্বল মানুষকে তাহাদের উপযোগী যুগধর্ম্ম (ভক্তিমার্গ) শিক্ষা দিবার জন্যই ঐরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। আমাদের সদাকাল বাহ্য বিষয় সঙ্গ অভ্যাস থাকাতে, ইন্দ্রিয়াদির (অন্তঃকরণের) বহির্মুখীবৃত্তি চলিতেছে; যাবৎ মনের একাগ্রবৃত্তি দ্বারা ঈশ্বরে নিরোধ অভ্যাস না করিবে, তত্ত্বজ্ঞান (আত্মতত্ত্ববোধ) হইলেও ঐ ইন্দ্রিয়াদি মন পর্য্যন্ত উহার অন্তরালে অবকাশ পাইলেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইবে না কি? তখন সাধকের কি করা উচিত? হয় অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস দ্বারা নিরোধ সমাধি (চিত্তের লয়) আনয়ন কর, আর না হয়

দিনরাত্র ঈশ্বরের নাম, রূপ, গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন ও মননাদি দ্বারা মনের সমতা (ঈশ্বরে একাগ্রতা) আন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পাদাদি বাহ্যবিষয় (ঐহিক সুখের) ব্যাপারে নিযুক্ত না করিয়া কোন মহাপুরুষের বা অবতারের বা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা ভাল নহে কি? আমাদের হস্তকে বল, হস্ত, তুমি সেই ভূতভাবন ভগবানের উদ্দেশ্যে চন্দন পুষ্প ধুপাদি অর্পণ কর *। পদ, তুমি তাঁহার উদ্দেশ্যে তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া তাঁহার ভক্তগণের সঙ্গ কর। কর্ণ, তুমি সেই পরমগুণময়ের গুণ ও নামই শ্রবণ কর। জিহ্বা, তুমি সেই পরম রসাল করুণাময়ের গুণরাশি (স্তুতি) কীর্ত্তন করিয়া নিজে কৃতার্থ হও ও অন্যকে ঐ গুণকীর্ত্তন শুনাইয়া কৃতার্থ কর। চক্ষু, তুমি তাঁহার পরম ভাবব্যঞ্জক মোহন মূর্ত্তি (এই বিশ্বরূপ ছবি) দর্শন করিয়া নিজেকে সার্থক কর, এবং অন্য ভক্তদের ইঙ্গিত কর যে, এই ত্রিভুবনময় চিত্রই তাঁহার ভাসা, ইহাই তোমার অন্তরাত্মার মনোমুগ্ধকর আলেখ্য = (বিশ্বরূপ) †। যিনি দিনরাত্র এই ভাবে থাকিতে পারেন, তিনি অসামান্য অলৌকিক পুরুষ নহেন কি? মহাপ্রভু এই অলৌকিক ভাবই শিক্ষা দিয়াছিলেন। অধিকারী (ব্যক্তি সমূহ) ভেদে মানবের সহন শক্তির (ধৈর্য্যের) মাত্রানুসারে সময়ে সময়ে (যুগে যুগে) সাধনের কঠোর নিয়ম বদলাইয়া যায়। ‡ সাধন সুগম, সরল ও কোমলভাবাপন্ন করিবার জন্য মহাপ্রভু

---

* এ বিষয়ে বৌদ্ধ ও রোম্যান্‌ক্যাথলিকগণ ভাল, ঐরূপ হিন্দুর মতন ঈশ্বরোদ্দেশে পুষ্প ধূপাদি অর্পন করেন। মুসলমানগণও ঐরূপ অনুষ্ঠান করেন॥

† মহাপ্রভু সমুদ্রের নীল জল ও নীলাকাশাদি দর্শন করিয়া সমাহিত হইতেন। ভাবুক ভিন্ন অন্যে ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন না।

‡ যুগে যুগে ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন হয় কি না, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্ম ও আর্য্য সমাজ প্রভৃতি তাহার নিদর্শন নহে কি?—তবে কোন্‌ মতে কি পরিমাণ সত্য আছে বিচার্য্য। ফল কথা কাহারও ধর্ম্মবিশ্বাস ভাঙ্গা উচিত নহে; যিনি যাহা ধরিয়া আছেন, তাহা ধরিয়া সমাহিত হইতে (চিত্ত একাগ্র ও নিরোধ করিতে) পারিলেই প্রকৃত তত্ত্বের সহিত (পূর্ণব্রহ্ম = সৎ চিৎ মাত্র

চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া ভগবৎপ্রেম ভক্তির উৎস হইতে নাম সংকীর্ত্তনরূপ স্রোত বহাইয়া গিয়াছেন। *তাঁহার উপদিষ্ট এই ভক্তিমার্গ সনাতন মার্গ; "শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্র", "পরভক্তি সূত্র" প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। মহাপ্রভু ঐ ভক্তিমার্গের সংস্কার করিয়া গিয়াছেন মাত্র, কোন নূতন মত চালান নাই; অতএব হিন্দুমাত্রেই (যদি অনুকুল হয়) ইহা কেন না অবলম্বন করিবেন? ইহাতে কেহ যেন না মনে করেন যে, আমরা সকল হিন্দু সমাজকে নিজ নিজ মত (ইষ্ট=দেবদেবী) ছাড়িয়া 'চৈতন্য ভজা' 'হরিবোলা' হইতে বলিতেছি। যে হিন্দুসম্প্রদায়ের (হিন্দু কেন, যে কোন সম্প্রদায়ের) যে দেব, দেবী ইষ্ট, তিনি সেই ইষ্টেরই এই (মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের উপদিষ্ট) ভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া নাম সংকীর্ত্তন ও ধ্যানাদির (হরিকীর্ত্তন, কালীকীর্ত্তন, শিবকীর্ত্তন, খৃষ্টান যীশুগুণ কীর্ত্তন, ইস্লাম খোদার কীর্ত্তন, (যে ভাব যাঁহার প্রিয়) স্রোতে নিজ শরীরকে (বাহ্যইন্দ্রিয়াদি) প্লাবিত করুন ও নিজ নিজ সম্প্রদায়কে প্লাবিত করান, তাহা হইলে নিজ নিজ অন্তর্জগৎও আপ্লুত হইবে। অন্তঃকরণের একাগ্রতা=(সমাধিনিষ্ঠ চিত্ত পরিণাম) আসিবে, মন বিষয়বাসনা হইতে উপরত হইবে। এই "ভক্তিমার্গ" কত সহজ ও কোমল, কত শীঘ্র মানব হৃদয় ভগবদ্ভাবে গলিয়া যায়, যাঁহারা একবার ইহা অনুষ্ঠান করিয়া সেই প্রেম উৎসের কণামাত্র সুধারস আস্বাদন করিয়াছেন, যাঁহারা একবার সেই বিশ্বনাথের নামেও প্রেমে গলিয়াছেন, যাঁহাদের চক্ষে একবার প্রেমাশ্রু দেখা দিয়াছে, তাঁহারাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।!!

এই "ভক্তিমার্গ" প্রবলাগ্নি, ইহার দ্বারা সহজে লৌহের ন্যায় কঠিন, মলিন পাপপূর্ণ মানব হৃদয় গলিয়া ঢলঢলে স্বর্ণের ন্যায় হয়; তখন তাহা যে ছাঁচে ঢালিবে, সেইরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইবে। সাংখ্যাদি দর্শনোক্ত তত্ত্বজ্ঞান রূপ চিত্র উজ্জ্বল ভাবে ঐ গলা সোনাতে (চিত্তে) অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এইজন্য জ্ঞানকেও চতুর্থভক্তি আখ্যা দিয়াছেন।

কি ব্রাহ্ম, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান, সকল সম্প্রদায়েরই এই ভক্তিমার্গের নাম সংকীর্ত্তন =(উচ্চস্বরে ভগবানের উপাসনা বা প্রার্থনা) বিধিবদ্ধ আছে, বৌদ্ধগণও (যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না) এই সংকীর্ত্তন (গাথাদি) গান করিয়া থাকেন। তাই বহু পুরাকাল হইতে হিন্দুশাস্ত্র শ্রীশ্রীভগবানের নাম সংকীর্ত্তন বিধি দিয়াছেন, এবং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু আসিয়া এই কলিযুগে মানবের মলিন ধর্ম্মভাব দেখিয়া "নাম সংকীর্ত্তন" আরও বিশেষ ভাবে প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুদর্শন শাস্ত্রের মতে স্থূল সূক্ষ্মাদি পদার্থের বিদ্যমানতা নাই,

---

=পুরুষ) মিলন হইবে। এই জন্য পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্যই নানা ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, যাঁহার যেটী অনুকূল তিনি তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে করিবেন। আজ তোমার যে ধর্ম্মভাব আছে, কালই তাহা পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এইরূপ পরিবর্ত্তন তাবৎ চলিতেছে ও চলিবে যাবৎ চিত্ত একাগ্র নিরুদ্ধ হইয়া প্রকৃত তত্ত্ব (পূর্ণব্রহ্ম= সৎ চিৎ=পুরুষ) সাক্ষাৎকার না হইবে।

এক মূলাশক্তি (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি) ঐ স্থূল সূক্ষ্মাদি দ্রব্যে সদা পরিবর্ত্তিত (প্রচলন দ্বারা) হইতেছেন। পাশ্চাত্য মতেও উহা স্বীকৃত হইয়াছে, অর্থাৎ matter বলিয়া কোন স্থূল পদার্থ নাই, এক মূলকারণের ভিন্ন ভিন্ন প্রচলনই মহাভূতাদি (vortex theory)। ঐ উভয়মতোক্ত প্রমাণ আশ্রয় করিয়া স্থির হইতেছে যে, মহাপ্রভুর ভূত জয় হইয়াছিল; ৺পুরীধামে মহাপ্রভুকে একটী ঘরে আবদ্ধ করিয়া ভক্তগণ সকলে দ্বারদেশে প্রহরির কার্য্য করিতেছিলেন, প্রাতে সকলে উঠিয়া ঐ গৃহের দ্বার খুলিয়া দেখেন যে, তিনি ঐ গৃহে নাই, দ্বার পূর্ব্ববৎ বদ্ধই আছে ; অনেক অনুসন্ধানের পরে তাঁহাকে পুরীর ভিতরে মূর্চ্ছিতাবস্থায় পাওয়া যায়। কখন কখন মহাপ্রভুর শরীর ভাবাবেশে ৭।৮ হস্ত লম্বা হইয়া যাইত। নাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বনের হিংস্র পশু ব্যাঘ্রকেও নাচাইতেন। তাঁহার তিরোভাব হইলে, তাঁহার স্থূল শরীর পাওয়া যায় নাই, অদৃশ্য হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন শ্রীশ্রীজগন্নাথের দারুময় মূর্ত্তিতে তাঁহার স্থূল দেহ মিলাইয়া গিয়াছিল, ইত্যাদি অনেক অলৌকিক ঘটনা তাঁহার জীবদ্দশায় ঘটিয়াছিল। এই সকল ঘটনা অনেকে হাসিয়া উড়াইয়াছেন। বস্তুতঃ এই সকল ঘটনা হিন্দু দার্শনিক ও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সাইকোলজিষ্ট (আত্মতত্ত্ববিদ্) গণের মত আশ্রয় করিয়া সত্য বলিয়া প্রমাণ হয়। দার্শনিকের মতে আমাদের মনই স্থূল শরীর প্রভৃতি চালাইয়া থাকে, স্থূল শরীরও ইন্দ্রিয়াদি মনের অধীন হইয়া কার্য্য করে, মন ইহাদের যে কোন ভাবে চালাইতে পারে। বেদান্ত মতে ভাবনাময়ই (idealism) জগৎ। যোগ দর্শনের মতে এই স্থূল শরীরকে সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মভাবে কঠিন লৌহময় গৃহ, যাহার একটী দ্বার বা ছিদ্র (প্রবেশ পথ) নাই, তাহার ভিতরে লইয়া যাওয়া যায়, বায়ু, জল, সূর্য্যরশ্মি প্রভৃতিতে স্থূল দেহকে পরিণত করা যায়, ইহা যিনি করিতে পারেন, তিনি ভূতজয়ী যোগীশ্বর। এই সূক্ষ্মচিত্ত পরিণাম Psychic locomotion পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ (Psychologist)ও স্বীকার করেন, পাশ্চাত্য Psychologist বলেন, "Psychic locomotion so—far in advance of the movement of even the swiftest motor car seems as hard to belive as was the first news of marcanis wireless telegraphy. But the writer has his theory to offer He says ;— It may be asked how is possible that an organised being can become desolved, so as to pass through solid wall, and be rematerialised again ? —It seems that for the pu₊pose of solving this question we should understand the mystery of matter and force. We should then perhaps find that we are ouiselves an organism of foices composed of vibration of ether upon so law a scale as to appear as. What we call "matter" and that matter and force esentially one and the samething. We know that the highest may control the lower the active the passive.

Mind can control the body and spirit the emotions of the mind, If our spirituality were fully developed there is no reason why we should not be able, by the power of our spiritual will to change the vibrations of which our material body is composed and send them as "organised force" guided by our thought, to any part of the world.

We know that the influence of mind gradually changes that physical body *, perhaps if our mental force were stronger great changes in our physical constitution might be produced at will and certain things which now are regarded as impossible would be found to be perfectly natural;"

অতএব এই যুক্তি আশ্রয় করিয়া বুঝিবে যে,মহাপ্রভু চৈতন্যদেব দ্বারা ঐ সকল অলৌকিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি না? মহাপ্রভু তিরোভাব কালে স্থূলশরীর ঐ ভূতজয়ী শক্তি প্রভাবে মহাভূত বা দারুময় শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ মূর্ত্তিতে লয় করিয়াছিলেন, এ কোন বিচিত্র কথা? এইরূপ মহাপুরুষকে তোমরা কি বলিবে? ভগবদ্ ভক্ত না ভগবানের পূর্ণাবতার (সাযুজ্যমুক্ত পুরুষ)? ভগবান্ বুদ্ধ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, প্রভুযীশু, হজরত মহম্মদ প্রভৃতি যত মহাপুরুষ বা অবতার যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতরে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই কোন না কোন অলৌকিক শক্তি থাকা স্বীকৃত আছে; অতএব তাঁহারা সকলেই অসামান্য পুরুষ নহেন কি? কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন, তাড়িত শক্তি সঞ্চার (mesmerism) দ্বারা ঐরূপ অনেক অলৌকিক কার্য্য করা যায়, সুতরাং মহাপ্রভু যে ঐ শক্তি সঞ্চার দ্বারা তাঁহার ভক্তগণকে অদ্ভুত ঘটনা দেখান নাই তাহার প্রমাণ কি? এত আমাদের স্বমতের কথাই হইল, ঐ মনঃশক্তি প্রভাবে শক্তি সঞ্চারক নিজ মনের ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করিয়া দর্শকের মন ও বাহ্য ইন্দ্রিয়াদি অভিভূত করিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করাইয়া লয়েন বা দেখান, সেইরূপ সকল মহাপুরুষের বা মহাপ্রভু চৈতন্যের আধ্যাত্মিক বা মানসিক শক্তির আধিক্য ছিল বলিয়াই তিনি নিজ শরীর, ইন্দ্রিয়ও স্থূলভূতের প্রচলন (সাংখ্যোক্ত অভিমান ও অস্মিতা) পরিবর্ত্তন করিয়া স্থায়ীভাবে ভক্ত দর্শকগণকে যাহা ইচ্ছা তাহাই দেখাইয়া বা করাইয়াছিলেন। তবে (mesmeriser) আমাদের মত সামান্য শক্তি সম্পন্ন বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় সম্পাদন করিতে পারেন, আর যোগী বা মহাপুরুষ বা অবতার ঐশ্বরিক

---

* মনের এই শক্তি প্রভাবে ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ষড়্ভূজ ধারণ করিয়া ছিলেন। অহল্যা পাষাণী হইয়াছিলেন। নহুষ রাজা কৃকলাস হইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে এইরূপ বহু ঘটনা বিবৃত আছে॥ সত্বগুণের প্রবলতা হইতে—মানবের স্থূল শরীর দেবত্বে পরিণত হয়। এবং তমোগুণের চরমাবস্থায় নিরয়যোনী কৃকলাসাদি) হয়।

ভাবাপন্ন বলিয়া মহাভূতেরও প্রচলন (ভূতাভিমান) বদলাইয়া দিতে পারেন। অতএব ঐ পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডিত হইল। একটী নবীন ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, "চৈতন্যোপদিষ্ট বৈষ্ণবধর্ম্ম আমাদের বল, বীর্য্য নষ্ট করিয়াছে," একথা আমরাও স্বীকার করি, অর্থাৎ বর্ত্তমান বৈষ্ণব বাবাজীরা (নেড়ানেড়ীর দল) তাহাই বটে। তাহারা নাম মাত্র বৈষ্ণব, প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম সাধন করেন না। কালে সকল ধর্ম্মেরই ব্যভিচার হয়। কিন্তু যিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব, তাঁহার সিংহের ন্যায় বিক্রম। তিনি অহিংসা ধর্ম্মপালন দ্বারা সকলের নিকট অভয় প্রাপ্ত হন। মহাভারতাদিতে যে সকল প্রকৃত বৈষ্ণব রাজার উল্লেখ আছে, তাঁহাদের বিক্রমে একদিন ভারত স্তম্ভিত হইয়াছিল। যথা হংসধ্বজ রাজা প্রভৃতি। যে খরধার কৃপাণ ও রাইফেলের গুলিতে বনের ভীষণ হিংস্র ব্যাঘ্র বশীভূত হয় না, সে গুলি খাইয়াও আক্রমণকারী গোলন্দাজকে নিপাত করে; একজন বৈষ্ণব চূড়ামণি উচ্চ হরিনাম করিয়া ঐ ব্যাঘ্রকেও বশীভূত করিয়া ছিলেন। সেই বৈষ্ণব চূড়ামণি * কে? সকলেই জানেন। দুর্দ্দান্ত পাঠানও সেই হরিনামে বশ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। যদি তুমি প্রকৃত চরিত্রবান্ বৈষ্ণব হও, কেহ তোমার তেজকে দমন করিতে পারিবে না। সেই বৈষ্ণব ধর্ম্ম আমাদের হীনপ্রভ করিয়াছে যাঁহাদের ঐ ধারণা আছে, তাঁহরা তাহা ভুলিয়া যান।

১৯। শেষ কথা, কোন এক কেন্দ্রে=বাহ্য বা আন্তর বিন্দু=মূর্ত্তি—নাম, রূপ, গুণে সাধকের মন কেন্দ্রীভূত—(একাগ্র হইলেই) ইষ্ট সিদ্ধি হয়। ইহার একটী সামান্য উদাহরণ, তাড়িত শক্তি সকল স্থানেই আছে, কিন্তু কোন স্থানে কেন্দ্রীকৃত হইলেই বিদ্যুৎ ও অগ্নি প্রকাশ হয়; সেইরূপ সাধকের মন একাগ্র হইলেই প্রকৃত পরমার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

২০। উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে, যে দিন সমগ্র ভারতবাসী ও সসাগরা পৃথিবীর লোক, ক্ষুদ্র জাতিভেদ ও সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মভাব ভুলিয়া গিয়া "সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মপাদপের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লইবেন, (সকল প্রাণীকে আপনার ন্যায় দেখিবেন ও আচরণ করিবেন, সেই দিন আবার ভারতে ও পৃথিবীতে শুভদিন আসিবে, হিংসা দ্বেষ, যুদ্ধ বিগ্রহ একবারে পৃথিবী হইতে উঠিয়া যাইবে। ২৪৪৮ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে ভগবান্ গৌতম বুদ্ধ এবং ৪২০ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের (জীবে দয়া * *) প্রচার করিয়া ছিলেন, যাহাতে জীবের অশেষ কল্যাণ ও শান্তি সাধিত হইয়াছিল। আজও ৶ পুরীধাম এই ভেদ রহিত সাম্যধর্ম্মের কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে।। হায়! আবার সেই দিন কি

---

* মহাপ্রভু।

। এক অন্নসত্রে ৶ জগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ সকল বর্ণই একত্রে ভক্ষণ করিতেছেন, কিন্তু হায়! মূল উদ্দেশ্য "সার্ব্বভৌমিক" ধর্ম্ম=অভেদাত্মজ্ঞান সকলে বিস্মৃত হইয়াছেন।।।

ভারতে আসিবে !!! ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য এই দ্বিভুজ শরীরে অভিমান পরিবর্ত্তন করিয়া ষড়্ভুজ হইয়া ছিলেন, এবং যাঁহার পার্ষদগণেরও অসামান্য প্রেম উৎস ছুটিয়াছিল, * তাঁহাকে নিশ্চয় ভূতজয়ী যোগীশ্বর (সাযুজ্য মুক্ত = পূর্ণ) বলিতে হইবে। যে যে মহাপুরুষের ভূতেন্দ্রিয় জয়ের (পঞ্চমহাভূতের অভিমান পরিবর্ত্তন) উল্লেখ আছে, যে কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই তিনি আসুন না কেন ? তাঁহাকে ভগবানের পূর্ণাবতার বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে॥ যেহেতু এই ভূতাভিমান (=জীবিতাবস্থায় স্থূল শরীরের অভিমান) পরিবর্ত্তন সামর্থ্যষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ঈশ্বরেরই আছে, জীবের নাই।†

সমাপ্ত।

---

* মহাপ্রভু গুণ কর্ম্মানুসারেই ("চাতুর্বর্ণং ময়াসৃষ্টং × × × × গীতা") ব্রাহ্মণেতর বর্ণকেও শ্রেষ্ঠাসন দিয়াছিলেন। এই গুণকর্ম্ম হইতেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রচলিত হইয়াছে। তাহার একটী ক্ষুদ্র উদাহরণ (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত হইতে) দিতেছি, "শ্রীচৈতন্য দেবের মাহাত্ম্য বর্ণনাতীত, তাহা ভক্ত ব্যতীত অনুভব করিতে পারেন না। শ্রীবাস আঙ্গনে নৃসিংহরূপ দেখান এবং জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেন, তাঁহার প্রিয় পার্ষদ বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র ইঁহার নদীয়ার অন্তঃপাতী জব্না গ্রামে বাস, দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ, নীলাচলে প্রভুসঙ্গে বাস করিতেন, দিগ্বিজয় পণ্ডিত জয় করিয়া কবীন্দ্র উপাধি পান, তার পর প্রভুর আজ্ঞানুসারে পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকার অন্তর্গত সানেড়া গ্রামে বাস, বহুতর শিষ্য করিয়া শ্রীশ্রীভগবৎ সেবা স্থাপন করেন, অদ্যাপি তাঁহার বংশের ব্যক্তিগণ ঐস্থানে ও অন্যত্রও বাস করিতেছেন। প্রবাদ আছে যে, ঐ বংশস্থিত ব্যক্তিগণ বুক চিরিয়া উপবীত দেখাইয়া ছিলেন এবং উহাঁদের মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও বলদেব ও কবীন্দ্র প্রভুর সেবা স্থাপন আছে।" ঐ বংশের শ্রীযুক্ত মোহান্ত শশীমোহন গোস্বামী নামক জনৈক ভাগবত এক্ষণে ৺ নবদ্বীপধামে বাস করেন। বুক চিরিয়া উপবীত দেখান কোন্ বিচিত্র কথা।। ইহা দর্শন ও বিজ্ঞানানুমোদিত। "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আছে, নির্লোমবিষ্ণু দাস আর গঙ্গাদাস এসবার সঙ্গে প্রভুর নীলাচলে বাস।" যে দ্বিজ বৈশ্য জাতীয় সুবর্ণবণিকদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণসমাজ ঘৃণা করেন, সেই সুবর্ণবণিকের রাজা উদ্ধারণ দত্তকে মহাপ্রভু দ্বাদশ গোপালের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। তাঁহার জন্ম-স্থান সপ্তগ্রামে সাংপ্রতি বৈশ্য-সমিতি (সুবর্ণবণিকগণ) মহা উৎসব করিয়া থাকেন। শ্রীযুক্ত বাবু প্রসাদ দাস বড়াল তথায় এক মন্দির দিয়াছেন।

† ঐ ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত পুরুষ বিশেষই সাংখ্যের প্রকৃতিসংযুক্ত পুরুষ। সগুণ ঈশ্বর।
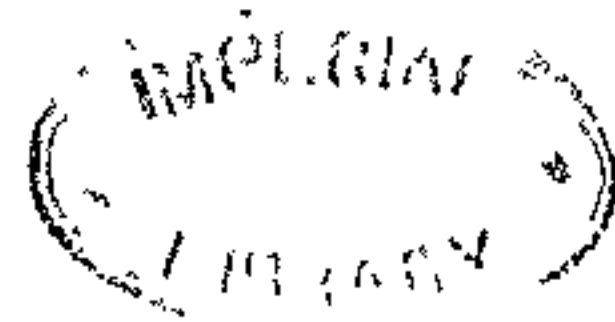
পরিশিষ্ট।

১। নিগুর্ণ পূর্ণব্রহ্মের অর্থাৎ সৎ চিৎ মাত্রের বা সাংখ্যের কেবল পুরুষের সত্তাবলম্বন করিয়া প্রকৃতি সংযোগে যাবতীয় পদার্থ ও জীব উৎপন্ন হইয়াছে। সগুণ ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত ঈশ্বরও ঐ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগজ; তাই ঐ নিগুর্ণ পূর্ণব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া পুরাণাদিতে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ভগবানের পূর্ণাবতার।

২। অতএব সার্ব্বজনীন উপাসনা ও সাম্যবাদ গ্রন্থে সাযুজ্য মুক্ত পুরুষই ভগবানের পূর্ণাবতার হন বলাতে যাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন, তাঁহাদের ঐরূপ ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণই দেখি না। ইতি।